সচিত্র

কেদার-বদরীকা

ভ্রমণ রহস্য

শ্রীগৌরহরি ঘোষ

[প্রথম সংস্করণ]

১৩৫৮

[মূল্য তিন টাকা]

"বিদ্যাশ্রম"

৩নং নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা।

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) গ্রন্থকার, ৩নং নারিকেল বাগান লেন,
গড়পার, কলিকাতা—৯

(২) কিশোর লাইব্রেরী,
২৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রিন্টার—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত
লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ
১[illegible]নং জগন্নাথ দত্ত লেন,
কলিকাতা—৯

ভূমিকা

কবি বা সাহিত্যিক নহি, লেখনী আমার আয়ত্তের বাহিরে। তথাপি এই গ্রন্থ লিখিবার প্রলোভন কোনও প্রকারে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। ধর্ম্মপিপাসু হিন্দুমাত্রেরই মনপ্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে হিমালয়ের পবিত্র তীর্থগুলির দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। কেদার বদরীনারায়ণের পথ অতি দুর্গম এবং ভীতিপ্রদ এইরূপ কাহিনী শুনিয়া অধিকাংশ তীর্থযাত্রী নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। এতদিন আমারও মনোভাব ঐরূপই ছিল। কিন্তু জানিনা হঠাৎ আমার প্রতি তাঁর অপার করুণা কেন হইল—নচেৎ অদমনীয় উৎসাহ, অসীম সাহস আমার মধ্যে কেমন করিয়া আসিল? স্বনামধন্য বহু সাহিত্যিক ও রসপিপাসু এই পথের ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তথাপি আমি আনন্দস্বরূপের রূপ মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া সহজ কথ্য ভাষায় পথঘাটের যথার্থ সত্য ঘটনাবলীর সহিত বহু পৌরাণিক তথ্য এবং আলোকচিত্রের সমাবেশে পুস্তকখানির বৈশিষ্টতা রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।

প্রকৃতির লীলাকুঞ্জ! পর্ব্বতগাত্রে শিরা উপশিরার ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে অলকানন্দা, মন্দাকিনী, গঙ্গা, ভাগীরথী! মধুময় সমীরণ এবং নির্ঝরিণীর সুপেয় বারিধারা দুর্গম পথযাত্রীর অবসাদ বা ক্লান্তি নিমেষে হরণ করিয়া লয়। নদীর কলকল ধ্বনি শুনিয়া কবির কথা মনে পড়ে—

"আমি বসে বসে তাই ভাবি,
নদী কোথা হ'তে এল নাবি।
কোথায় পাহাড় সে কোনখানে,
তাহার নাম কি কেহই জানে।

কেহ যেতে পারে তার কাছে,
সেথায় মানুষ কি কেউ আছে।
তাহার মাথার উপরে শুধু,
সাদা বরফ করিছে ধুধু।
সেথা রাশি রাশি মেঘ যত,
থাকে ঘরের ছেলের মতো।"

প্রকৃতই নদীর উৎস মানুষের অগম্য। তুষারমণ্ডিত মেঘরাজ্য যখন সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তখন মনে হয় অরূপের রূপভাণ্ডার কী অলৌকিক। নির্ব্বাক হইয়া অপলক নেত্রে ঐ অপরূপ সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকি। উত্তরাখণ্ড যাত্রার প্রতি পদবিক্ষেপে যে পরিমাণে অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছি তাহার তুলনায় পথের কষ্ট অতি নগণ্য।

ভোগের কর্ত্তা হইতেছে মন; সুখ বা দুঃখ আমরা যাহা কিছু ভোগ করি না কেন—সবই মনে। এই পথের মাহাত্ম্য এইরূপ যে, যে প্রকার যাত্রী হউক না কেন—হউক সে ঘোর ঈশ্বর বিরোধী—তথাপি তাহার মনে উপলব্ধি হইবে আনন্দময়ের সেই অপরিসীম আনন্দ।

বদরীকাশ্রমের পথের পথিককে ধর্ম্মশালা, চটি, এক চটি হইতে অপর চটির ব্যবধান, পানীয় জল, (অধিকাংশ ঝরণার জলই অপেয়, ফুটাইয়া পান করা উচিত কিন্তু নলের জল পেয়), সরকারী চিকিৎসালয় এবং পোষ্ট অফিস প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিনিয়তই সজাগ থাকিতে হইবে। কোন একটি চটিতে অবস্থান কালে পরবর্ত্তী চটির বিবরণ জানিবার জন্য উল্লিখিত বিষয়গুলি গ্রন্থ মধ্যে যথাযথ পুনঃ পুনঃ লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত যাত্রীর বিশেষ সুবিধাদায়ক করা হইয়াছে। কিন্তু সুখাভিলাষী উপন্যাস-পাঠকের পক্ষে ইহা কিঞ্চিৎ দৃষ্টি কটু অনুভূত হইতে পারে। তীর্থপথে প্রত্যক্ষ জ্ঞানদ্বারা যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহাই সহৃদয় পাঠক পাঠিকার হস্তে দিবার চেষ্টা করিলাম।

পুস্তক সম্বন্ধে আমার বিশেষ বক্তব্য আর কিছুই নাই, তবে এইটুকু যে, পুস্তক লিখিবার জন্য যেরূপ যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন আমাতে তাহার বিশেষ অভাব। ইহা পাঠ করিয়া যদি কেহ বিন্দুমাত্রও পরিতৃপ্ত হন তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব। ইহাতে ভ্রম ও প্রমাদাদি যে সকল ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হইবে তাহার জন্য একমাত্র আমার অজ্ঞানতাই দায়ী।

এই পুস্তক প্রণয়নকালে কাগজ সংগ্রহ, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, সংশোধন, ব্লক নির্ম্মাণ, মুদ্রণ প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল মহানুভাবের সহায়তা লাভ করিয়াছি তাঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

অক্ষয় তৃতীয়া
২৫শে বৈশাখ ১৩৫৮

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

তীর্থাভিলাষীর পবিত্র করকমলে আমার
এই উত্তরাখণ্ডের ক্ষুদ্র ভ্রমণ কাহিনী
অর্পণ করিলাম

সূচী

চিত্রসূচী

কেদার বদরীকার পথের নির্দ্দেশ

সচিত্র

কেদার বদরীকা

ভ্রমণ রহস্য

যাত্রার পূর্ব্বে

গত বৎসর দক্ষিণভারতে রামেশ্বর ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য, ভারতবর্ষের শেষসীমা কন্যাকুমারিকায় কুমারীদেবী এবং পূর্ব্বে উড়িষ্যায় পুরীধামে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের দর্শন লাভ করিয়াছি। এ বৎসর পশ্চিমভারতে দ্বারকায় যাইবার ইচ্ছা মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। স্কুলের ছুটী গ্রীষ্মাবকাশেই বেশী দিন পাওয়া যায়। অন্য ছুটী কম বলিয়া এই ছুটীতে কলিকাতার বাহিরে যাইবার বরাবরই একটা প্রবল ইচ্ছা। মে মাসের ১৫ই নাগাদ্ ছুটী হয়; দেশ ভ্রমণে বাহির হইব বলিয়া সেই দিনের অপেক্ষায় বসিয়া আছি। দ্রষ্টব্য দেশগুলির খসড়াও একটা করা হইয়াছে। যথা আগরা, জয়পুর, পুষ্কর, দ্বারকা, সোমনাথ, প্রভাস, বোম্বাই সহর আর হায়দ্রাবাদে এলোড়া ও অজান্তা গুহা।

ফেব্রুয়ারী মাসে হঠাৎ হিন্দুমুসলমানে দাঙ্গা বাধিল, ইহার বিস্তৃতি বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশ পাইল।

কয়েকদিন পরে অমৃতবাজার পত্রিকায় আবার দেখিতে পাইলাম যে অজান্তার খোদিত কয়েকটি মূর্ত্তি কোন দুর্ব্বৃত্ত বিকৃত করিয়াছে। এই সকল ঘটনা লক্ষ্য করিয়া বিদেশে যাইবার বাসনা দিন দিন লোপ পাইতে লাগিল। এদিকে ছুটির দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল—মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল; কি করি—কোথায় যাইব! হঠাৎ মনে হইল—কেন! উত্তরাখণ্ডে বদরীকাশ্রমের পথে যাত্রা স্থরু করিলে মন্দ কি হয়! পুণ্যভূমি পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পথ—হিন্দুর পবিত্র তীর্থ একই ঢিলে দুই কাজ হইবে। তীর্থের পুণ্যসঞ্চয়ের সহিত প্রকৃতির মধুময় দৃশ্য উপভোগ করা যাইবে।

১৯৩১ সালের গ্রীষ্মকালে আমি হরিদ্বার, হৃষীকেশ, লছমণঝোলা, দেরাডুন, মুসৌরী প্রভৃতি স্থানে প্রায় দেড়মাস ভ্রমণ করিয়াছি। বদরীকাশ্রম পথের দুর্গমতা অনুভব করিয়া সে যাত্রায় চুপ্‌চাপ্‌ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

বাল্যকাল হইতেই পাহাড় পর্ব্বত ঝরণা ও তুষারক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণের বেজায় ঝোঁক। দার্জ্জিলিং, কামাখ্যা ও গৌহাটী প্রভৃতি পার্ব্বত্য দেশগুলি অত্যন্ত আনন্দের সহিত ভ্রমণ করিয়াছি। ১৯৩৬ ও ৩৭ সালে পরপর দুই বৎসর হরিদ্বার দর্শনের স্থযোগ পাই কিন্তু বদরীকাশ্রম যাইতে সাহস হয় না। ১৯৩৭ সালের গ্রীষ্মে হরিদ্বার, দিল্লী হইয়া কাশ্মীর এবং ফিরিবার সময় অমৃতসহর, লাহোর, আগ্রা, এলাহাবাদ প্রভৃতি সুদূর স্থানগুলি নির্ব্বিঘ্নে ঘুরিয়া আসিলাম। কিন্তু হিন্দুর এই মহাতীর্থ, চতুর্ধামের

শ্রেষ্ঠধাম নারায়ণের তপোভূমি বদরীকারণ্যের বেলায় আতঙ্ক উপস্থিত হয় কেন? এ বৎসর মনকে আর ভাবিবার সময় দিলাম না। মাত্র সাতদিন পরে বিদ্যালয় বন্ধ হইবে, এরই মধ্যে যাহা কিছু সাব্যস্ত করিতে হইবে। মনে হইল বদরীকাশ্রম ফেরত কোন লোকের নিকট যদি ঐ সুদূর পথ সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানিতে পারি তাহা হইলে হয়ত কিছু সাহস হইতে পারে। এইরূপ ভাবিতেছি, পরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখি আমাদেরই পাড়ার শ্রীবুদ্ধদেব বসু কৈলাস, বদরীকাশ্রম প্রভৃতি স্থানগুলির ভ্রমণ বৃত্তান্ত ফিল্মে তুলিয়া নানা স্কুল ও কলেজে দেখাইতেছেন। সংবাদটি দেখিয়া মনটা বেশ প্রফুল্ল হইল। বিলম্ব না করিয়া প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান সুনীল কুমার দেকে বুদ্ধবসুর বাড়ীতে আমার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিস্তারিত ভাবে জানিবার জন্য পাঠাইলাম। সে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি ব্যতীত এ পথে যাওয়া যায়না এবং তিনি তাঁহার পাণ্ডাকে আমার নিকট পাঠাইবেন। পাণ্ডা যথাকালে আসিয়া উপস্থিত। তিনি মূলপাণ্ডার ছড়িদার নাম শ্রীলুঙ্গিরাম। "উত্তরাখণ্ড হিমালয় পথপ্রদর্শিকা" নামক কয়েক পাতার একখানি পুস্তিকা আমার হস্তে দিয়া জানিতে চাহিলেন আমি এবং আর কে কে যাইব। উত্তরে তাঁকে জানাইলাম আমি একা—নিঃসঙ্গ। লুঙ্গিরামের ব্যবহারটি ভাল আমার সুবিধা ও অসুবিধার কথা তাঁকে সবই বলিলাম। দু এক কথায় জবাব দিয়া তিনি স্পষ্ট আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না আমি হরিদ্বারে যাই

তিনি আমার জন্য কিছুই করিতে পারেন না। পুস্তিকায় উল্লিখিত হরিদ্বারের ঠিকানায় যাইতে পারিলে সেখানে লোকজন আছে তাহারাই তীর্থের কার্য্য করাইবে, থাকিবার ও রন্ধনকার্য্যের জন্য বাসন এবং প্রয়োজন হইলে কেদার-বদরী পর্য্যন্ত বিশ্বাসী গোমস্তাও পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই সকল আলোচনার পর লুঙ্গিরাম তো চলিয়া গেল। ১১ই মে রওনা হইব এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়াছি। আর মাত্র তিনদিন বাকী, রেলের ভীড়ের কথা মনে হইল। একখানি দ্বিতীয়শ্রেণীর বার্থ সংরক্ষণের ইচ্ছায় ফেয়ার্‌লি প্লেসের বুকিং অফিসে হানা দিলাম। কিন্তু বার্থ পাওয়া তো দূরের কথা সিট্ সংরক্ষণ করিতে পারিলাম না। যে কাউণ্টারে যাই একই বুলি—আজ বার্থ সমস্ত বুক হইয়া গিয়াছে কাল আসিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি। অগত্যা সাধারণ দ্বিতীয়শ্রেণীর একখানি টিকিট লইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

যাত্রা সুরু

আজ ২৮শে বৈশাখ ১৩৫৭ সাল ইং ১১ই মে ১৯৫০। রাত্রি আটটা পাঁচমিনিটে ট্রেণ। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাঁধিতে লাগিলাম। গ্রীষ্মকালে নিত্য-ব্যবহার্য্য পোষাক এবং প্রচণ্ড শীতের উপযুক্ত গরম পোষাক ও বিছানা, রবারের

তলাযুক্ত জুতা, (চামড়ার জুতা চলিবে না) বৃষ্টির জন্য ছাতা, বিছানা বাঁধিবার রবার ক্লথ এও বৃষ্টির জন্য, থালা গ্লাস, ঘটি, মাঝারি বালতি ; খালিপেটে জলপান করা অনুচিত বিবেচনায় মিছরি, জলখাবারের জন্য অনেকদিন থাকিবে পচিবে না, এরূপ খাবার হিসাবে বাদাম, কিসমিস, আখরোট ও খেজুর, মাছির উপদ্রব নিবারণের জন্য লম্বা দড়িযুক্ত মশারি এবং তালাচাবি লইলাম। লুঙ্গিরামের কথামত কেবল রন্ধনের জন্য কোন বাসন লইলাম না। এখন আমার আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে—কেবল যাত্রা করিলেই হয়।

বহুকালের আশা আজ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে কিন্তু তবুও যেন মনের কোন খানটায় অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। কেবলই মনে হইতে লাগিল একলা ঐ দুর্গম পথে যাইব, পরিচিত সঙ্গী কেহ রহিল না,—শেষ পর্য্যন্ত মাঝপথ হইতে ফিরিতে হইবে না তো ? বিদেশে চারবেলার খোরাক কে যোগাইবে ? বাড়ীতে তৈয়ারী খানা খাওয়া অভ্যাস। নিত্য নিজে রাঁধিয়া লইতে হইবে ! পথশ্রান্তির পর কোথায় জল, বাট্‌না, আগুন, হাঁড়ি মাজার ব্যাপার, এই সকল চিন্তা যেন শেষ মুহূর্ত্তে আমায় কাতর করিয়া ফেলিল। যদিও আমার মনের মধ্যে এই সকল বিষয় তোলপাড় হইতেছে কিন্তু বাহিরে কাহারও সহিত আলোচনা করি নাই,—পাঠকই আজ কেবল জানিতে পারিলেন। মন সংযত করিলাম এই ভাবিয়া যে যখন মানসিক কল্পনা আজ কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তখন যতই অসুবিধা হউক না কেন

মত পরিবর্ত্তন করা চলিবেনা। মনে মুখে এক হওয়া উচিত। এখন শক্ত ব্যাপার নিত্য রান্না, তা আর কি! যে কুলি মাল বহিবে তাহাকে কিছু বেশী পারিশ্রমিক দিলেই তাহার দ্বারাই সব যোগাড় করিয়া লওয়া যাইবে আর আমি কেবল রান্নাটা করিয়া লইব—অত ভাবিবার কি আছে!

বেলা প্রায় ৩টা, আমার প্রাক্তন ছাত্র নন্তে তাহার দুইজন বন্ধুকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। একজনের নাম শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ লাহিড়ী এবং আর একজন শ্রীশ্যাম মোহন কুমার, পাড়া প্রতিবেশী এবং আমার সহিত তাঁহারা বদরীকাশ্রমে যাইবেন। তারপর বেলা সাড়ে তিনটার সময় নন্তের বড় মামা শ্রীকাননবিহারী শীল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। আমি ভাবিতেছি এত বেশ হইল, আর দুঃখ কোথায়? এখন আমি তো আর একা নহি, চারিজন হইলাম। অবশেষে নন্তেকে আমার দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট খানি বদলাইয়া সঙ্গীদের সহিত তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটিয়া আনিতে পাঠাইলাম। আমার সহিত নন্তের যাইবার যে একটা প্রবল আগ্রহ কিছুদিন ধরিয়া ছিল তা বেশ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। হঠাৎ আজ সে একেবারে বেসুরো, দৃঢ়কণ্ঠে জানাইল যে সে যাইবে না; অথচ তাহার আশাতেই তাহার বন্ধু দুইজন যাইতেছে।

টিকিট চারিখানা লইয়া নন্তে ফিরিয়া আসিল। হাওড়া হইতে হরিদ্বার প্রতি টিকিটের মূল্য চব্বিশ টাকা। রাত্রি আটটা পাঁচ মিনিটে ট্রেণ। সাতটার সময় বাড়ী হইতে বাহির হইলেই

চলিবে। শেষমুহূর্ত্তে ঠিক হইল নন্তেও আমাদের সহযাত্রী হইবে। প্রতিবেশী শ্রীঅরুণ কুমার ঘোষের সহায়তায় দেরাডুন এক্সপ্রেসে অত্যধিক ভীড়ের মধ্যেও আমরা পাঁচজন জায়গা করিয়া লইলাম। আজ মনে বেশ স্ফুর্ত্তি, ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

হরিদ্বার

৩০শে বৈশাখ প্রাতে ছটা ত্রিশ মিনিটে হরিদ্বারে পৌঁছিলাম। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব নয়শত বাইশ মাইল। প্ল্যাটফরম্ হইতে বাহিরে আসিতেই টাঙ্গাওয়ালারা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হরিদ্বারের পথঘাট দ্রষ্টব্যস্থল আমি চিনি, পাণ্ডাবাড়ীতে উঠিব, 'টাঙ্গা লাগিবে না বাবা' বলিয়া একজন কুলি রফা করিয়া পাণ্ডার ঠিকানা শ্রীপান্নালাল কুম্ভকরণ, ভেরামলের হাবেলী সর্ব্বনাথ ঘাটের উদ্দেশ্যে চলিলাম। পাণ্ডার ঠিকানায় আসিয়া বদরীকাশ্রমের পাণ্ডার নাম উল্লেখ করায় আমরা এখানে দ্বিতলে একখানি শুইবার ঘর, রন্ধনের জায়গা, কলের জল সমেত বাথরুম ও ড্রেন পাইখানা ব্যবহারের জন্য পাইলাম। কুলির দক্ষিণা মিটাইয়া দিয়া তাহাকে বিদায় দিব এমন সময় সে প্রস্তাব করিল যে সেও আমাদের সহিত মাল লইয়া বদরীকাশ্রম যাইবে; প্রতি সের মালের জন্য যাতায়াত মজুরি তিন টাকা লইবে। তাহার প্রস্তাব এই সর্ত্তে মানিয়া লইলাম যে আমাদের রন্ধন,

জল ও বাসন মাজার কাজও তাহাকে করিতে হইবে, এবং তৎ পরিবর্ত্তে সে খোরাকি পাইবে। লোকটি বয়স্থ নেপালী ব্রাহ্মণ, নাম জয়রাম এবং ব্যবহার অতিশয় মধুর।

এখন সকলে স্নান ও মধ্যাহ্ন ভোজনের বন্দোবস্তর জন্য ব্যস্ত, কিন্তু দেখা গেল গতরাত্র হইতে নৃপেন্দ্র অর্থাৎ নীলু জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে। আজ আমরা এ বেলায় রন্ধনকার্য্য স্থগিত রাখিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে (গঙ্গার ঘাটে) স্নান, গঙ্গা পূজা, ঘাটের উপর অনেকগুলি মন্দির আছে তন্মধ্যে একটিতে বিষ্ণুর চরণচিহ্ন দর্শন করিয়া কুশাবর্ত্তঘাটে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলাম। পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। পাণ্ডার পুরোহিত সঙ্গে থাকিয়া তীর্থকার্য্য করিয়া দিলেন। নিকটেই সর্ব্বনাথ শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। কুম্ভে স্নান হইলনা বটে তবে বৈশাখী সংক্রান্তিতে স্নান হইল। নীলুর জন্য গরম দুধ লইয়া বাসায় ফিরিলাম। আমরা সকলে এবেলার আহার নিরামিষ ভোজনাগারে সারিয়া লইলাম। ষ্টেশনের নিকটস্থ রেল লাইনের তলা দিয়া যাইয়া বিল্বকেশ্বর দর্শন করিলাম।

ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট মর্ম্মর প্রস্তরে গাঁথা, প্রধান গঙ্গা হইতে একটি শাখা চক্রাকারে ঘুরাইয়া পুনঃ মূল গঙ্গার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তোহই প্রধান শাখার যে তীব্রস্রোত তাহা মন্দীভূত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এই ঘাটেই স্নান করা উচিত। হিমালয়ের সিওয়ালিক পর্ব্বতশ্রেণী

হইতে গঙ্গা প্রবাহিত হইয়া এই হরিদ্বারের সমতল ক্ষেত্রে আসিয়াছে। এখানে গঙ্গা কোথাও একমুখী যেমন হৃষিকেশে, লছমণঝোলায়—কোথাও ত্রিধারা যেমন কঙ্খলে আবার কোথাও সপ্ত ধারা যেমন কাঁকড়িতে (পূর্ব্বে এখানে গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, বর্ত্তমানে ইহা জাওলাপুরে অবস্থিত)। গঙ্গার জল ও হাওয়া এখানে দুইই ঠাণ্ডা, বৈশাখ মাসের শেষেও কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসের মত ঠাণ্ডা পড়ে।

বৈকালে ত্রিমস্তকধারিণী মায়াদেবী, চতুর্ভূজা দূর্গামূর্ত্তি দর্শন করিয়া একটাকা বার আনায় একখানি টাঙ্গা ভাড়া করিয়া দেড়মাইল দূরে কন্‌খলে সত্যযুগের দক্ষপ্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞস্থল, দক্ষভবন (এখন ভগ্নাবশেষ) দক্ষমহারাজের প্রতিষ্ঠিত দক্ষেশ্বর শিব, (এখানে গঙ্গার নীলধারা) নিকটে রাজবাড়ীর পাশেই সতীঘাট এবং প্রায় মাইল খানেক দূরে সতীকুণ্ড দেখিয়া হরিদ্বারে ফিরিয়া একমাইল দূরে ভীমগোড়া তীর্থ দেখিতে যাইলাম। এখানে একটি কুণ্ড আছে ইহা ভীমকুণ্ড নামে অভিহিত। দেখিলাম কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির আছে। ইহাদের একটির মধ্যে গুহা আছে। পুরোহিতেরা বলেন ঐ গুহা ভীমসেনের অশ্বের পদাঘাতে সৃষ্ট হইয়াছে। এখান হইতে বাসায় ফিরিলাম। রাত্রিকালীন আহার্য্য কানন ভাই ও জয়রাম ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

এখানে পশ্চিম দক্ষিণ কোণে মনসা পাহাড়, চূড়ায় মনসাদেবীর মন্দির, আর পাহাড়ের পশ্চিম অংশে একজায়গায় সূর্য্যকুণ্ড।

পশ্চিম উত্তরে চণ্ডী পাহাড়, ইহার উচ্চশিখরে চণ্ডীদেবীর মন্দির এবং অন্যান্য মন্দিরও আছে। ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে বসিলে গঙ্গার দক্ষিণে মনসা ও উত্তরে চণ্ডীপাহাড় স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু চণ্ডীপাহাড় যাইতে অনেক সময় লাগে। প্রাতে পাঁচটায় যাত্রা করিলে ফিরিতে বেলা দশটা হইয়া যায়। মমিনপুরের লক্‌গেটের উপর দিয়া যে পথ কনখলের দিকে গিয়াছে, উহা পার হইয়া সেচ্‌ বিভাগের কার্য্যালয়ের পশ্চাৎভাগের পথ ধরিয়া চণ্ডীপাহাড়ে যাইতে হয়। মাঝে একজায়গায় গঙ্গা পার হইতে হয়। খেয়া নৌকা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। এই পারের দূরত্ব দশহাতের অধিক নহে। চণ্ডী পাহাড়ের উপরে জল পাওয়া যায় না। পাহাড়ে উঠিতে হইলে সকালের দিকেই যাওয়া ভাল নচেৎ ফিরিবার পথে রৌদ্রের প্রখরতায় বড় কষ্ট হয়।

সন্ধ্যায় গঙ্গার ধারে ব্রহ্মকুণ্ডে গঙ্গাদেবীর সন্ধ্যারতি দেখিলে মনে বেশ শান্তি বোধ হয়। ভক্ত যাত্রীরা ফুলের নৌকা কিনিয়া তাহাতে কর্পূরের আলো দিয়া গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দেয়। নৌকা যেন মালিকের অন্তরে সুখ বিধান করিবার নিমিত্ত জলের চঞ্চল গতির সহিত তালে তাল মিলাইয়া আনন্দের লহরী দূর হইতে দূরান্তরে মুহূর্ত্তে লইয়া যায়। এইরূপ শত শত ভাসমান দীপ গঙ্গাদেবীর বক্ষে অতিশয় মনোরম দৃশ্য সৃজন করিয়া ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিধারা সঞ্চারিত করে। সন্ধ্যার—এই দৃশ্যটি জলের ধারে বসিয়া লক্ষ্য করিলে বেশ তৃপ্তি বোধ হয়।

হরিদ্বারে প্রতি বার বৎসর অন্তর একবার করিয়া পূর্ণকুম্ভের

যোগ হয়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন হইতে কুম্ভযোগ উপলক্ষে এখানে স্নানাদি আরম্ভ হয়। বৈশাখের কিছুদিন পর্য্যন্ত বহু সাধুসমাগম ও মেলা বসিয়া থাকে। ভারতের ধর্ম্মার্থী হিন্দু এই যোগে এখানে মিলিত হন। কুম্ভের এইরূপ ইতিহাস, যে সুরাসুর একত্রে সমুদ্রমন্থন করায় সুধাভাণ্ড (কুম্ভ) উত্থিত হইয়াছিল। ঐ সুধা কে পাইবে ইহা লইয়া উভয় পক্ষে বিশেষ কলহ উপস্থিত হয়। দেবতারা ঐ কুম্ভ লইয়া প্রথমে হরিদ্বারে রাখিয়াছিলেন, পরে প্রয়াগে (এলাহাবাদে), পুনঃ তথা হইতে উজ্জয়িনীর ধারা নগরে এবং শেষে গোদাবরী তীরে নাসিকে লুকাইয়া রাখেন। তদবধি ঐ সমস্ত স্থানে কুম্ভযোগ ও সাধুসমাগম চলিয়া আসিতেছে। এখানে বহু ধর্ম্মশালা, পাণ্ডাবাড়ী এবং স্বতন্ত্র বাড়ীও ভাড়া পাওয়া যায়। হাঁসপাতাল, পোষ্ট অফিস, থানা পুলিস, নিত্য বাজার, সকল রকম জিনিষের দোকানপাট এখানে আছে। সহর লোকে লোকারণ্য—পাকা বাড়ীতে ভরপূর।

'হর কি পড়ি' বলিয়া, ব্রহ্মকুণ্ডের পাশে বৃহৎ শান বাঁধান চাতাল; সাধারণে এইখানেই সকাল সন্ধ্যায় বেড়াইতে আসে। একটী ব্যাপার বেশ লক্ষ্য করিলাম যে আমাদের হিন্দুধর্ম্মের যতগুলি শ্রেণী আছে তন্মধ্যে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বেশী। কারণ বৈষ্ণবেরা অর্থাৎ বিষ্ণু ভক্তরা এই স্থানের নাম হরিদ্বার (হরি কি দ্বার) বলেন এবং শৈবগণ বলেন হরদ্বার (হর কি দ্বার)।

আর একটি দেখিবার বস্তু গঙ্গায় অসংখ্য মৎস্য। কুশাবর্ত্তঘাটে

পূর্ব্বপুরুষগণের পিণ্ডদানান্তে যখন ঐ পিণ্ডগুলি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে রুই জাতীয় মৎস্য দশ বার সের ওজন হইবে, আসিয়া উপস্থিত। জলের গভীরতা কম থাকায় মৎস্যের পৃষ্ঠগুলি জলের উপরে প্রায় চারি ছয় আঙ্গুল উঠিয়াছিল। গাভী অথবা অশ্ব পৃষ্ঠে যেরূপ হাত বুলান যায় আমি ঠিক সেই ভাবেই মৎস্যের পৃষ্ঠে হস্ত বুলাইলাম। কেহ যে তাহাদিগকে স্পর্শ করিতেছে ইহা তাহারা বুঝিলই না। খাওয়া শেষ হইলে শোঁ শোঁ করিয়া যে যেদিকে পারিল ডুব মারিল।

হৃষীকেশ

৩১শে বৈশাখ—সকাল সাতটা ত্রিশ মিনিটে বাস যোগে হরিদ্বার ত্যাগ করিলাম। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ সাড়ে পনের আনা ভাড়া। সাত মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর একস্থানে বাস থামিল। স্থানটি কালীকম্বলী ওয়ালার ক্ষেত্র। এখানে ধর্ম্মশালা ও সত্যনারায়ণ বিগ্রহ বর্ত্তমান। সাধারণে এ স্থানটিকে “সত্যনারায়ণ” চটি বলে। স্থানটি জঙ্গল মধ্যে অবস্থিত, লোকালয় নাই বলিলেই হয়—বিশেষ নির্জ্জন। অর্দ্ধঘণ্টাকাল অপেক্ষা করার পর বাস পুনঃ ছাড়িয়া দিল। সাত মাইল পথ পার হইয়া আমরা নয়টা ত্রিশ মিনিটে হৃষিকেশের বাসষ্ট্যাণ্ডে আসিয়া পৌঁছাইলাম। মালপত্র কুলি জয়রামের জিম্মায়। এখন আশ্রয়

অনুসন্ধানে ধর্ম্মশালার চেষ্টায় চলিলাম। এখানে বাবা কালী-কম্বলী ওয়ালার প্রধান আড্ডা (Head quarter). প্রথমে ঐখানেই যাইলাম—কিন্তু কোন সুবিধা হইল না। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা বাজিতে চলিল, সঙ্গে রোগী রহিয়াছে তাহার বিশ্রাম ও পথ্যের ব্যবস্থা আগে—এইজন্য আমরা একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। শুনিলাম নিকটেই গঙ্গার ধারে "সূরজমল" ধর্ম্মশালা ; সেই দিকেই চলিলাম এবং ব্যবস্থাও হইল। এখানকার কার্য্যাধ্যক্ষ যিনি তাঁহার ব্যবহার বেশ ভদ্রজনোচিত। রোগীর দুগ্ধের ব্যবস্থা করিয়া আমরা স্নান ও আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম। রন্ধনাদি ব্যাপারে কানন ভাই নন্তে ও শ্যাম উদ্যোগী হইলেন। আমাকে কিছুই ভাবিতে হইল না। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমি নন্তেকে লইয়া দেবপ্রয়াগাভিমুখী বাসের খবর লইতে বাহির হইলাম। বাস ষ্ট্যাণ্ড এখানে দুইটি, হরিদ্বার হইতে যে পাকারাস্তা এখানে বাজারের নিকট মিলিত হইয়াছে ঐ মিলন স্থানের উভয় পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ বাসের আড্ডা। বাজারের এক দিক হইতে হৃষিকেশ-হরিদ্বার ও হৃষিকেশ-লছমন ঝোলা এবং অপর দিক হইতে হৃষিকেশ-কীর্ত্তিনগর দেবপ্রয়াগ হইয়া বাস যাতায়াত করে। কিন্তু ঐ শেষোক্ত যাতায়াত ব্যাপার যাকে ইংরাজীতে বলে "ওয়ান ওয়ে" ; প্রাতে ছাড়ে ও বৈকালের দিকে আসে। বাস বহুসংখ্যক এবং সিট্ গুনিয়া টিকিট বিক্রয় হয়। একদিন পূর্ব্বে আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে—উচ্চ নীচ শ্রেণীও আছে।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয় গঙ্গাব কলকল ধ্বনি ও খরস্রোত ভাবুকের মনে বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করে। শ্রীভরত মন্দির এখানের প্রাচীন মন্দির এবং ইহা ব্যতীত আব এক প্রাচীন শ্রীবিষ্ণু মন্দিরও আছে। এই বিষ্ণু যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু নামে পরিচিত। ভগবৎ চিন্তা ও নির্জ্জন বাসেব পক্ষে এই আর্য্যঋষিগণের তপোভূমি হৃষিকেশ সাধক মাত্রেবই আকর্ষনীয় স্থান। এখানে নিত্য বাজার, দোকান, প্রয়োজনীয় সব কিছু পাওয়া যায়। অনেক ধর্ম্মশালা ও ডাকবাংলা আছে। এখানে গঙ্গা এবং ইঁদারার জল আছে কিন্তু পানীয় হিসাবে ইঁদারার জলই ব্যবহার করা উচিত।

বাস ষ্ট্যাণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া বৈকালে বাহির হইলাম। এখানের দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দেখিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে দেব-প্রয়াগগামী বাস চলাচল অফিসে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পরদিন প্রাতে আমরা দেবপ্রয়াগ যাইব ঠিক করিয়া বাসে পাঁচটি বসিবার স্থান সংরক্ষণ করিয়া লইলাম। খরচ মাথাপিছু এক আনা মাত্র; অফিসের বাহিরে আসিয়া একখানি টঙ্গা ধরিলাম। লছমণঝোলা যাতায়াত সাড়ে আট টাকা টোল সমেত। ভাড়া রফা করিয়া আমরা চারিজন গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। নীলু অসুস্থ বলিয়া তাহার দর্শনাদি কিছুই হইল না, সে ধর্ম্মশালায় রহিয়া গেল। দেড় মাইল পথ আসার পর "মৌনী কি রেতী" নামক স্থানে আসিলাম। এখানে শ্রীশত্রুঘ্ন মন্দির, স্থানটি একটি তপোবন। পুরাকালে এই স্থান মুনিঋষিদের তপস্যার স্থান

ছিল। এখান হইতে বদরীকাশ্রমে যাইবার জন্য কুলি ও ডুলি বন্দোবস্ত করা যায়। আরও দেড়মাইল পথ আগাইয়া আসার পর লছমণঝোলায় আসিলাম। গাড়ী লছমণঝোলার কাছাকাছি একস্থানে দাঁড়াইয়া গেল। পথ মৌনী কি রেতী হইতে বরাবর পর্ব্বতগাত্র বহিয়া চলিয়াছে। রাস্তা বেশ প্রশস্ত। দক্ষিণে গঙ্গার প্রবাহ অপ্রতিহত গতিতে চলিয়াছে। পরপারে নীলকণ্ঠ পর্ব্বতমালা উচ্চ শিরে দণ্ডায়মান। আমরা লছমণঝোলার আধুনিক লৌহ সেতু পার হইয়া পরপারে যাইব। অল্প দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে গাড়ী চলার যে চওড়া রাস্তা তাহা এখানে লৌহ ফটক দ্বারা বন্ধ করা রহিয়াছে। এটি হইল বাসের "ওয়ান ওয়ে" পথ। আমরা দক্ষিণ ঘেঁসিয়া হাঁটাপথ ধরিয়া খানিকটা সিঁড়ি-পথ পার হইয়াই শ্রীলক্ষ্মণজীর ও ধ্রুবের মন্দিরে আসিলাম। দর্শনান্তে আরও অল্প অগ্রসর হইয়া গঙ্গার উপর লৌহসেতু পার হইলাম। এপারে আসিয়া দেখিলাম বামে ও দক্ষিণে উভয় দিকেই রাস্তা গিয়াছে। বামের পথ বদরীকাশ্রম যাইবার হাঁটাপথ এবং দক্ষিণে নীলকণ্ঠ পর্ব্বতের পাদমূলে স্বর্গাশ্রম। এখানে সাধু সন্ন্যাসীদিগের বহু আশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমেই বামে শ্রীরামজীর মন্দির এবং আরও কিছু অগ্রসর হইলে দক্ষিণে ও বামে কতকগুলি দেবমন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। এখান হইতে রাস্তা সোজা গঙ্গার সমান্তরালে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ গিয়াছে। ইহা নীলকণ্ঠ পর্ব্বতশ্রেণীর পাদমূলে অবস্থিত ও ইহাকে স্বর্গাশ্রম রোড বলা হয়। ইহার শেষপ্রান্তে, কালীকমলীওয়ালার ধর্ম্মশালা,

কার্য্যালয় ও অন্নসত্র। ধর্ম্মশালা হইতে গঙ্গাতটে ঐ রাস্তা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই মিলনস্থলে একটি সুন্দর শিব মন্দির ও নিকটেই পারাপারের নৌকা পাওয়া যায়। এই পারাপারের জন্য কোন মূল্য দিতে হয় না। নিষ্কাঞ্চন সাধু-সন্ন্যাসীদিগের পারাপারের জন্য কালীকম্বলীওয়ালা এই কিস্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মার্থী যাত্রীদিগকেও এই পারাপারের সুযোগ দেওয়া হয়। আমরাও এই স্থান হইতে পরপারে আসিয়া আমাদের অপেক্ষমান গাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে হৃষিকেশে আসিয়া পৌছিলাম। এখানে কুলি রেজেষ্টী করিবাব প্রধান অফিস। আজই আমাদের কুলি রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে। প্রাতঃ সাড়ে সাতটায় বাস ছাড়ে। দুইজন কুলি লাগিবে। জয়রাম তাহার ভাই পরিচয় দিয়া অপর একজন কুলি লইয়া আসিয়াছে, নাম বলবীর এবং কুলি অফিস হইতে মাল ওজন করিবার জন্য দুজন অনুমোদিত লোকও আসিয়াছে। ধর্ম্মশালাতেই তাড়াতাড়ি মাল ওজন করাইয়া কুলিদের লইয়া আমি, নন্তে ও শ্যাম "উত্তরাখণ্ড যাত্রা ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি (রেজিষ্টার্ড)" অফিসে কুলির পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া লইলাম। একমণ সাড়ে চব্বিশ সের মাল হইয়াছিল। অবশ্য আমার একলার নহে, পাঁচজনের একত্রে। সের প্রতি তিনটাকা দিতে হইবে রফা হইল এবং অগ্রিম পঁয়ত্রিশ টাকা জমা দিতে হইল। ইহার জন্য আমরা পাকা রসিদ পাইলাম। আমাদের প্রদত্ত পঁয়ত্রিশ টাকা হইতে কার্য্যাধ্যক্ষ স্বীয় পারিশ্রমিক এবং

রুদ্রপ্রয়াগ সঙ্গম— পৃঃ ৩৬

অপর দুই ব্যক্তির কুলি দুইজনকে সনাক্ত করিবার জন্য কিছু টাকা কাটিয়া লইল এবং বাকি টাকাটা উভয়কে ভাগ করিয়া দিল। ইহা দেখিয়া হিতোপদেশে 'বানরের পিষ্টক ভাগ' গল্পের কথা মনে পড়িল।

দেবপ্রয়াগ

১লা জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ছয়টার সময় ধর্ম্মশালার ম্যানেজারের নিকট রন্ধনকার্য্যের জন্য গতকল্য যে সকল বাসন লইয়াছিলাম তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। ভদ্রলোকের ব্যবহার অতি চমৎকার। কোনরকম পরভাব দেখিলাম না। বাস ষ্ট্যাণ্ডে আসিয়া আমাদের পাঁচজনের জন্য উচ্চ শ্রেণীর এবং কুলি দুইজনের নিম্নশ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিলাম। হৃষিকেশ হইতে দেবপ্রয়াগ প্রতি টিকিটের মূল্য যথাক্রমে পাঁচ টাকা চারি আনা ও চারিটাকা বার আনা। এ বৎসর কুম্ভ যোগ পড়ায় যাত্রীর ভিড় অত্যধিক হইয়াছে। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর এখানকার কর্ম্মচারী একখানি বাস দেখাইয়া বলিলেন ঐ বাসে আমাদের যাইবার স্থান সংরক্ষিত হইয়াছে। আমরা কুলির সাহায্যে মালপত্র গাড়ীর ছাদে উঠাইয়া লইয়া ভিতরে গিয়া বসিলাম। একই গাড়ীর মধ্যে উচ্চ (upper) ও নীচ (lower) শ্রেণীর ব্যবস্থা আছে।

এ পর্য্যন্ত আমাদের দলছাড়া অন্য কোন বাঙ্গালীর সহিত আলাপ হয় নাই। হরিদ্বারে অবস্থান কালে একতলার একটি ঘরে জন চারেক স্ত্রীলোক ও তাঁহাদের নায়ক হিসাবে একজন পুরুষকে দেখিলাম। তাঁহারাও শ্রীশ্রী৺কেদারবদরী দর্শনে বাহির হইয়াছেন। হৃষিকেশের বাসের আড্ডায় দুইজন বাঙ্গালীর সহিত আলাপ হইল। একজন সন্ন্যাসী ও অপরব্যক্তি গৃহী ব্রাহ্মণ, একই পথের যাত্রী। আমাদের সহিত একসঙ্গে যাইতে চাহেন কিন্তু উপায় নাই আমাদের টিকিট ক্রয়ের পর তাঁহাদের টিকিট ক্রয় করা হইয়াছে, অতএব ভিন্ন গাড়ীতে তাঁহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আমাদের গাড়ী প্রথমে ছাড়িল। লছমণঝোলার পথ ধরিয়া বাস ছুটিল। সেই লৌহ ফটক এখন খোলা হইয়াছে, ইহার মধ্যেই আমরা প্রবেশ করিলাম। বাসটা সংকীর্ণ পার্ব্বত্য পথের উপর দিয়া ধূলা উড়াইতে উড়াইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভিতর হইতে দেখিলাম বামে পর্ব্বতরাজি পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে এবং দক্ষিণে গঙ্গা সগর্ব্বে কলকল নিনাদে শিলারাজ্য প্লাবিত করিয়া পিছনের দিকে ছুটিয়াছে। বেলা সাড়ে নয়টার সময় "কৌড়িয়া" নামক স্থানে আসিয়া বাস একঘন্টা অপেক্ষা করিল। ইত্যবসরে এখানে গরম পুরী ও চা দ্বারা জলযোগ সারিয়া লইলাম। এখানে পানীয় জলের ভাল ব্যবস্থা নাই—মাত্র একটি নল, তাও ধারা ক্ষীণ। জায়গাটা উর্দ্ধগামী (up) এবং নিম্নগামী (down) বাসের মিলন স্থল। সমস্ত উর্দ্ধগামী বাস এখানে

আসিয়া থামিল এবং নিম্নগামী বাসগুলিও একে একে আসিয়া পৌঁছাইল। সাড়ে দশটায় পুনরায় রওনা হইলাম। এপথের বাস চালকেরা বিশেষ দক্ষ। পথ আঁকা বাঁকা ভাবে পর্ব্বত গাত্র বেষ্টন করিয়া বরাবর চলিয়াছে। বাম পার্শ্বে উচ্চশির পর্ব্বতরাজি এবং দক্ষিণে বেগবতী গঙ্গা কোথাও পঞ্চাশ হইতে একশত ফুট নিম্নে বহিয়া যাইতেছে আর মধ্যে একখানি গাড়ী যাইবার মত অপ্রশস্ত রাস্তা।

বেলা বারটা পনের মিনিটে দেবপ্রয়াগে আসিয়া বাস থামিল. দূরত্ব হৃষিকেশ হইতে চুয়াল্লিশ মাইল। বাস থামিবামাত্র স্থানটি যাত্রী, পাণ্ডা, কুলি, ডাণ্ডীওয়ালা ও ঘোড়াওয়ালার সমাগমে বেশ মুখরিত হইয়া উঠিল। আমরা এখন কোথায় আশ্রয় লইব তাহার জন্য চতুর্দ্দিক দেখিতেছি। যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি পর্ব্বত ও বৃক্ষরাজি, আর ভাগীরথীর পরপারে খেলাঘরের মত ছোট ছোট বাড়ীগুলি নানারঙের ছবির ন্যায় পর্ব্বতগাত্রে শোভা পাইতেছে। স্রোতস্বতী ভাগীরথীর স্বচ্ছবারি এইস্থানের এক পার্শ্ব ধৌত করিয়া অবিরাম গতিতে সঙ্গমাভিমুখী হইয়া সমুদ্রান্বেষণে ছুটিতেছে। সকাল হইতে অবিরাম গতিতে এতক্ষণ কেবল বাসে করিয়া পার্ব্বত্যপথে চলিয়াছি, কখন যে নামিব তাহার কোন স্থিরতা নাই। মন কেমন যেন অধৈর্য্য হইয়া উঠিল।

এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ঘর বাড়ীগুলির নির্ম্মাণ-কৌশল অভিনব। কিছুক্ষণ দূর হইতে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্যটি

দেখিলাম। বহুবার ভাবিয়াছি, বদরীকাশ্রম যাওয়া ভাগ্যে যদি কখন না হয় অন্ততঃ একবার দেবপ্রয়াগে যাইয়া ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গম দেখিয়া আসিব। আজ সেই সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে মনে করিয়া খুবই আনন্দ অনুভব করিলাম।

আমরা ধর্ম্মশালায় যাইব এইরূপই সাব্যস্ত করিয়াছি কিন্তু একজন পাণ্ডার ছড়িদার আসিয়া বলিল যে সে আমার বদরীকাশ্রমের পাণ্ডার লোক এবং গঙ্গার পরপারে অল্প দূরেই তার যাত্রীনিবাস আছে; সেখানে আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না। বেলা অনেক হইয়াছে, কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। নিকটেই ভাগীরথীর উপর মজবুত লৌহ-সেতু অতিক্রম করিয়া প্রায় পাঁচমিনিটের মধ্যে পাণ্ডার যাত্রীনিবাসে আসিলাম। একখানি বৃহৎ ঘরের চাবি খুলিয়া দিয়া ছড়িদার চলিয়া গেল এবং কথা রহিল পরদিন প্রাতে আমাদিগকে তীর্থের কার্য্য করাইয়া দিবে। ঘরখানির মাপ ৩০ ফুট লম্বা, ১৫ ফুট চওড়া; রাস্তার পার্শ্বে বৃহৎ তিনটি দরজা ও একটি জানালা এবং গঙ্গার দিকে একটি দরজা আছে। এই গঙ্গার দিক ঘেঁষিয়া পরপর পাঁচটি বিছানা পাতা হইল এবং অত্যধিক মাছির জন্য মশারিও টাঙ্গাইতে বাধ্য হইলাম। একে একে সকলে সঙ্গমে স্নান সারিয়া লইলাম, কেবল নীলু স্নান করিতে পারিল না। জ্বর নাই কিন্তু বিশেষ দুর্ব্বল। কানন ভাই কুলিদের লইয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল। আজ চারদিন কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছি কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই।

মশারির মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিলাম। আহারান্তে নন্তে ও শ্যাম বাসের খবরাখবর লইয়া আসিল। পরদিন মধ্যাহ্নে আমরা যে বাসে করিয়া হৃষিকেশ হইতে আসিয়াছি ঐ বাসই "কীর্ত্তিনগর" পর্য্যন্ত যাইবে। আমরা আজ আর বাহির হইলাম না, বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। একজন ঘোড়াওয়ালা আসিয়া উপস্থিত, ঘোড়া ভাড়া লইবার জন্য অনুরোধ করিল। আমার মনও ঘোড়ার কথাই ভাবিতেছিল। এতক্ষণ পরে সুযোগ আসিল। পার্ব্বত্য পথ হাঁটিতে পারিব না এইরূপই আমার ধারণা বরাবর। কারণ একবার বিহারে পরেশনাথ পাহাড়ে পার্শ্বনাথ দেখিতে গিয়াছিলাম। পাহাড়টির পাদমূল হইতে যাতায়াত চৌদ্দমাইল। প্রাতে সাড়ে পাঁচটায় রওনা হইয়া বেলা তিনটায় নামিয়া আসি। উঠিবার সময় মধ্যপথে বামপদের গোড়ালি হইতে উরু পর্য্যন্ত শিরায় এমন টান বোধ হইল এবং যন্ত্রণা হইতে লাগিল যাহাতে উপরে উঠিবার বাসনা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে আমার বদরীনারায়ণের পর্ব্বতসঙ্কুল পথের ভীতি চাপিয়া রহিয়াছে। মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছি যে যদি কখনও যাই হাঁটিয়া যাইব না কারণ আমার আপন চরণদ্বয়কে বিশ্বাস নাই। এখন ঘোড়াওয়ালার সহিত আলাপ করিয়া জানা গেল কেদার ও বদরী দেবপ্রয়াগ হইতে যাতায়াত মজুরি তিনশত টাকা লাগিবে, বুঝিলাম দর করিলে ইহা আড়াইশতে নামিবে। ঘোড়া ভাড়ায় এতটা টাকা এক কথায় খরচ করা উচিত কি না এবং সঙ্গীরা যখন সকলেই হাঁটিয়া যাইবে, আমি একা কি ভাবে

ঘোড়ার পিঠে চড়িব এই কথা ভাবিতেছি। লোকটিকে পরদিন প্রাতে দেখা করিতে বলিয়া শুইয়া পড়িলাম।

২রা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বসিয়া আছি—প্রায় ছয়টা হইবে এমন সময় পাণ্ডাঠাকুর পুরোহিত লইয়া আসিলেন। কালক্ষেপ না করিয়া পুরোহিতের সহিত বশিষ্ঠকুণ্ডে আসিলাম। বাসা হইতে এক মিনিটের পথ। এই বশিষ্ঠকুণ্ডই মহাপূণ্যভূমি দেবপ্রয়াগের ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল। পর্ব্বত গাত্রেস্থ সাধারণ প্রস্তরময় স্থান কাটিয়া ঘাট ও স্নানের চত্বর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। জলে নামিবার কালে দক্ষিণে ভাগীরথীর প্রবাহস্থানকে বশিষ্ঠকুণ্ড এবং বামে অলকানন্দার প্রবাহস্থানকে ব্রহ্মকুণ্ড বলা হয়। স্রোত এত প্রবল যে জলে নামা অসম্ভব। অলকানন্দার স্রোত ভাগীরথীর ন্যায় প্রবল বেগবতী বটে কিন্তু জল মৃত্তিকা মিশ্রিত অর্থাৎ ঘোলা। ভাগীরথীর স্বচ্ছ ও অলকানন্দার ঘোলা জলধারা এখানে মিলিত হইয়া গঙ্গা নাম লইয়া নিম্ন ভূভাগে বহিয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিক পর্ব্বতে বেষ্টিত, মাথার উপর আকাশ এবং সম্মুখে সঙ্গমের উত্তাল তরঙ্গ,—বহুক্ষণ দেখিয়াও দর্শনাকাঙ্ক্ষা যেন মিটে না। এখানে পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান ক্রিয়া বিশেষ পুণ্যকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। সন্তানের পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে তীর্থসঙ্গমে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করা অর্থাৎ শ্রাদ্ধক্রিয়াদি ভক্তিপূর্ব্বক সমাপন করা। জলের প্রবল বেগ বলিয়া নামিয়া স্নান করা সম্ভবপর হইল না। ঘটি করিয়া জল তুলিয়া স্নান

সমাপনান্তে পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানাদি কার্য্য শেষ করিলাম। ঘটি করিয়া জল তুলিতে ভয় করিতেছিল পাছে স্রোতে ঘটি কাড়িয়া লয়। এখানে পাণ্ডা বা পুরোহিতের জুলুম নাই। পাণ্ডা বাঙ্গালা বলিতে পারে কিন্তু পুরোহিত পারে না। দেবপ্রয়াগকে দেবতীর্থ এবং সুদর্শন ক্ষেত্রও বলা হয়। এ সম্বন্ধে এইরূপ কাহিনী আছে যে সত্যযুগে দেবশর্ম্মা নামে পরম ধার্ম্মিক এক মুনি ছিলেন। তিনি এইস্থানে একহাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার একনিষ্ঠ তপঃ প্রভাবে ভগবান নারায়ণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন এবং তাঁহাকে ঈপ্সিত বর প্রদান করিতে চাহেন। ইহাতে মুনিবর ভগবৎসমীপে মস্তক অবনত ও যুক্তপাণি হইয়া গদ গদ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে তিনি জীবের মঙ্গলকামনায় এই কঠোর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছেন। নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় ও পাপীদিগের মুক্তি ভিন্ন তাঁহার অন্য কিছু কামনা নাই। ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী শ্রীহরি ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ! তোমার নিঃস্বার্থ সাধনায় আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। আজ হইতে তোমার এই তপোভূমি পরম তীর্থরূপে পরিগণিত হইবে। তোমার নামানুযায়ী এই পবিত্রধাম দেবপ্রয়াগ নামে খ্যাত হইবে। এই পবিত্রতীর্থ ভাগীরথী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে যে কেহ স্নান করিবে তাহার সর্ব্বপাপ নাশ হইবে এবং যে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে তর্পণ, শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডাদি দান কার্য্য করিবে তাহার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে। আজি হইতে আমার সুদর্শন

চক্র এই পবিত্রস্থান রক্ষা করিবে। হে মুনিবর! আমি আগামী ত্রেতাযুগে সূর্য্যবংশ সম্ভূত রাজা দশরথের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় তোমার গোচরীভূত হইব। এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

সঙ্গম হইতে বাসায় আসিয়া দেখি গতরাত্রের ঘোড়াওয়ালা অপেক্ষা করিতেছে। এদিকে নীলুর জ্বর পুনঃ আসিয়াছে। এই অবস্থায় তাহাকে লইয়া আর অগ্রসর হওয়া উচিত মনে হইল না, নন্তে ও শ্যামের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে কলিকাতা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। পাণ্ডাঠাকুরকে অনুরোধ করিলাম এমন একজন লোক দিবার জন্য যে, নীলুকে আজই হরিদ্বারে লইয়া কলিকাতাগামী ট্রেণে চড়াইয়া দিতে পারে। যাতায়াত বাস ভাড়া, মজুরি তিনটাকা ও খোরাকি এক টাকা ব্যবস্থা হইল। ঘোড়া সম্বন্ধে পাণ্ডাজীর সহিত কথা কহিয়া বুঝিলাম রাস্তা ভালই, সকলেই হাঁটিয়া যাইতেছে, ঘোড়া দরকার হয়না, বাজে খরচ কেবল এবং প্রয়োজন হইলে পথে খুচরা হিসাবে ঘোড়া পাওয়া যাইবে। ঘোড়াওয়ালাকে জবাব দিলাম যে উপস্থিত ঘোড়া আমার লাগিবেনা এবং তুমি কিছু মনে করিও না। ইহাতে সে কোন দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় এখান হইতে হৃষিকেশ যাইবার বাস পাওয়া যায়। সেইমত নীলুর খাওয়ার ব্যবস্থা এবং বিছানাপত্র বাঁধিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সমস্ত আয়োজন করা হইল। আমরাও আজ এখান হইতে যাত্রা করিতে চাই। বেলা

এগারটায় বাস পাওয়া যাইবে। কাননভাই আমাদের আহারের ব্যবস্থার জন্য বলবীরকে লইয়া বাজারে বাহির হইয়া গেল। এখন বেলা প্রায় দশটা, শ্যাম ও নন্তে নীলুকে একবার বশিষ্ঠকুণ্ড দেখাইয়া বাসে তুলিয়া দিল। কানন ফিরিয়া আসিয়া রন্ধনে মনোনিবেশ করিল। আজ বড় তাড়াতাড়ি, বারটার সময়ে আমাদিগকে যাত্রা করিতে হইবে। একমাত্র প্রয়াগসঙ্গমে স্নান ভিন্ন দ্রষ্টব্য কিছুই দেখা হইল না। বাসা হইতে এইবার বাহির হইলাম। রাস্তায় বেজায় ধূলা, বাসে যাতায়াত কালে মাথায় চুলের মধ্যে বিশ্রীভাবে ধূলা জমে; একটি সূতী গান্ধীটুপী জয়রামকে কিনিয়া আনিতে বলিলাম। আমি এখানকার দোকান চিনিনা কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইব, দেরী হইয়া যাইবে। সে অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল টুপি এখানে পাওয়া যায় না। একটা কথা—হরিদ্বারে রেল হইতে নামিয়া এইপথে স্থানীয় লোকদের নিকট বাঙ্গালা ভাষা অচল। এদের স্থানীয় এক একটা ভাষা আছে বটে কিন্তু হিন্দি সকলেই বুঝে। আমাদের কুলিরা নেপালী, তাহাদের সহিত হিন্দিতেও কথাবার্ত্তা চলে। নন্তেরা ফিরিয়া আসিল, আমি উহাদের সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। এখানে ভাগীরথী ও অলকানন্দার মিলনস্থান ব্যতীত রামচন্দ্রের প্রাচীন মন্দির দ্রষ্টব্য। আমরা এখন সঙ্গমস্থান দক্ষিণে রাখিয়া বামে অলকানন্দার তীর ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাস্তার উভয়পার্শ্বে নানা দোকান পাট। বহু ডাণ্ডীর দোকান রহিয়াছে।

নূতন ডাণ্ডীর দাম এবৎসর পঁয়ত্রিশ টাকা। যাঁহারা হাঁটিতে অক্ষম তাহাদের পক্ষে ডাণ্ডীভাড়া করাই শ্রেয়ঃ। কেহ কেহ নূতন ডাণ্ডী কিনিয়া কুলি ভাড়া করেন। বহনের জন্য চারিজন কুলির প্রয়োজন। হৃষিকেশ হইতে কেদারবদরী যাতায়াত ডাণ্ডীভাড়া সাড়ে চারিশত টাকা হইতে পাঁচশত টাকা। ইহাতে মাত্র একজন লোক বসিতে এবং সাত সের মাল সঙ্গে লইতে পারেন। দোকান দেখিতে দেখিতে এক সেতুর নিকট আসিলাম। পরপারে যাইতে ইচ্ছা হইল কিন্তু সময় অল্প, এতটা আসিয়া অপর দিকটায় কি আছে না দেখিয়া ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। সেতুর উপর উঠিলাম, মাঝামাঝি আসিয়া হৃষিকেশের বাসষ্ট্যাণ্ডে আলাপী সন্ন্যাসীর সহিত দেখা হইল। উভয়েই আনন্দিত হইলাম। আমার হাতে ক্যামেরা (Camera) দেখিয়া তিনি ফটো ছাপা হইলে মূল্য দিয়া লইবার এবং এইস্থান হইতে আমাদের সঙ্গী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে আমার কোন অমত থাকিতে পারে না বরং এই শেষের প্রস্তাবে আমি বিশেষ সুখানুভব করিলাম। তীর্থের পথে একটি সঙ্গী হারাইবার পর আমার আজ দুইটি সঙ্গী পাইবার সুযোগ আসিল। আমি তাঁহাকে বাস ছাড়িবার সময় উল্লেখ করিয়া শীঘ্র বাসষ্ট্যাণ্ডে আসিতে বলিলাম। সেতু পার হইয়া দেখিলাম পাথর বাঁধান বড় রাস্তার দুধারে বড় বড় মনিহারী, এদেশে প্রচলিত জামা কাপড় ও দর্জ্জি প্রভৃতির বহু দোকান রহিয়াছে, ধর্ম্মশালাও এইপথে। আমি এক কাপড়ের দোকান হইতে অর্দ্ধগজ মোটা

ধোয়া মাকিন দশ আনায় কিনিয়া তাহার বিপরীত দিকে দর্জির দোকান হইতে মাত্র চারিআনা মজুরি দিয়া একটি উত্তর প্রদেশের চলন মত টুপি তৈয়ার করাইয়া লইলাম। প্রায় পনের মিনিটের মধ্যে একটি টুপি প্রস্তুত করিয়া দিল। লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়া তাড়াতাড়ি বাসার দিকে ফিরিলাম।

এখন জিনিষপত্র বাধাবাঁধির ব্যাপার। এ বিষয়ে আমার বিশেষ কিছু ভাবিতে হয়না কারণ আমার পাছে কষ্ট হয় সেজন্য নন্তে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দেয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আজ আর বিশ্রাম হইল না, সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় আসিয়াই সেই সন্ন্যাসী ভদ্রলোক ও তাঁর সঙ্গীর সহিত দেখা। সন্ন্যাসী অভেদানন্দ সোসাইটি হইতে আসিয়াছেন, স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ নামে পরিচিত, আমরা মহারাজ বলিয়া থাকি এবং তাঁর সঙ্গীর বাড়ী রাণাঘাট, নাম শিবদাস ভট্টাচার্য্য—আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলি। সকলে একসঙ্গে ভাগীরথীর সেতু পার হইয়া বাসষ্ট্যাণ্ডে আসিলাম। এখানে বাসের টিকিট কিনিবার জন্য টিকিট ঘর (Booking office) নাই, তবে একটি কার্য্যালয় আছে। হৃষিকেশ হইতে যে সমস্ত বাস কীর্ত্তিনগর যাইবার জন্য এখানে আসে ঐ সকল বাসে যদি জায়গা থাকে বা এখানে যাত্রী নামিয়া যে জায়গা খালি হয় সেই জায়গায় নূতন যাত্রী লওয়া হয়। টিকিটের ব্যবস্থা একজন কার্য্যাধ্যক্ষ ও বাস চালকই যুক্ত-ভাবে করিয়া থাকেন। এখানে এই টিকিট কিনিয়া বাসে উঠা

নূতন যাত্রীর পক্ষে খুবই কষ্টকর। যাহা হউক আমরা এখন ছয়জন এবং দুইজন কুলি মিলিয়া আটজন একই বাসে উঠিয়া বসিলাম; উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণী আছে এবং বাসেই আমরা টিকিট পাইলাম। দেবপ্রয়াগ হইতে কীর্ত্তিনগরের ভাড়া উচ্চশ্রেণীর তের আনা মাত্র।

দেবপ্রয়াগ একটি পার্ব্বত্যনগর। সাগরতল হইতে ইহার উচ্চতা দুই হাজার ফুট। লছমণঝোলা হইতে হাঁটাপথে দুই মাইল গরুড়চটি, দুই মাইল রতাপানি, দুই মাইল গুলর, তিন মাইল নাইমুহানা, তিন মাইল বিজনী, তিন মাইল কুণ্ড, তিন মাইল বন্দরভেল, তিন মাইল মহাদেব, এক মাইল পাটি, তিন মাইল শেমালু, তিন মাইল কাণ্ডী, চারি মাইল ব্যাস ঘাট, চারি মাইল উমাবসু, দুই মাইল সৌড় এবং পৌনে দুই মাইল আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে। এখানে বাজার, দোকান, টেলিগ্রাফ অফিস এবং সরকারী হাঁসপাতাল ও উচ্চ শিক্ষালয় আছে। ভাগীরথীর জলই পানীয় হিসাবে ব্যবহার্য্য। এখান হইতে কেদারবদরী এবং গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীর যাত্রীদিগকে পথ বাছিয়া লইতে হয়, কারণ এইস্থান হইতে পথ বহুদিকে গিয়াছে। "উত্তরাখণ্ড বদরীনারায়ণ যাত্রার নূতন মাইল সূচী" অনুযায়ী হরিদ্বার হইতে গঙ্গোত্তরী একশত অষ্ট-আশি মাইল, কেদারনাথ একশত তেতাল্লিশ মাইল, বদরীনাথ একশত তিরাশি মাইল, এবং কেদারনাথ হইতে বদরীনাথ একশত মাইল। দেবপ্রয়াগ হইতে যমুনোত্তরী বিরানব্বই মাইল। এই

মাইল সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। হরিদ্বার হইতে কেদার ও বদরীর পথে মাইল এবং ফার্লং ফলক নিয়মিত ভাবে অঙ্কিত আছে।

বেলা একটায় বাস ছাড়িল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দক্ষিণে ভাগীরথীর সেতু পার হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চস্তরের পর্ব্বতগাত্রস্থ রাস্তা অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম। অতি অল্পক্ষণেই আমরা অলকানন্দার কুলে আসিলাম। এখন আমরা অলকানন্দার ধার বাহিয়া চলিয়াছি। বেলা তিনটার সময় পনের মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "কীর্ত্তিনগর" নামক স্থানে আসিলাম। ইহাই হৃষিকেশ কীর্ত্তিনগর বাসের সীমা। বাস হইতে অবতরণ করিলাম। পর্ব্বতগাত্র বহিয়া কিছু দূর নিম্নে অলকানন্দার উপর সেতু পার হইয়া তিন মাইল দূরে শ্রীনগর অবস্থিত। এ পথটুকু উপস্থিত পদব্রজেই যাইতে হইবে। প্রখর রৌদ্র, একটু ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হইল কিন্তু কোথাও ছায়া দেখিতে পাইলাম না। পরপারে যাইবার পথে—দক্ষিণে একখানি বাড়ীতে দুচারজন যাত্রী প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া আমি ঐদিকে আগাইয়া চলিলাম। দ্বারদেশে এক ভদ্রলোক সপ্রশ্ননয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। আমি আগ্রহভরে বলিলাম—প্রায় একঘণ্টা বিশ্রাম করিতে চাই, একটি ঘর পাওয়া যাইবে কি? তাঁহার অতিরিক্ত ভাড়া শুনিয়া সঙ্গীরা আমায় উহার সহিত চুক্তি করিতে নিরস্ত করিয়া অপরদিকে লইয়া আসিল। এদিকে গঙ্গার ধারে এক বৃহৎ টিনের চালাঘর দেখিতে পাইলাম।

কলিকাতা করপোরেসন মার্কেটগুলিতে ফড়েদের বসিবার সিমেণ্ট করা উচ্চ মঞ্চের অনুরূপ ব্যবস্থা। নানা শ্রেণীর যাত্রী এখানে সমবেত হইয়াছে। আমরাও এই স্থানের এক পার্শ্ব অধিকার করিলাম। এক ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিবার পর চারিটার সময় পুনঃ রওনা হইলাম। পথ নিম্নাভিমুখী, যাকে বলে "উতরাই" পথ। মাত্র সেতু মুখ পর্য্যন্ত আজ এই প্রথম পায়ে হাঁটিয়া উতরাই পথের সম্মুখীন হইলাম। এখানে ঘোড়া এবং ডাণ্ডী ভাড়া পাওয়া যায়। কানন ভাই একবার বলিল যদি আমার চলিতে কষ্ট হয় ত' একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। দেখিলাম শতকরা নিরানব্বই জন লোক হাঁটিয়া যাইতেছে, আর আমি এমন কি বাবু যে হাঁটিতে পারিব না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সকলের পশ্চাদনুসরণ করিলাম। পুল বেশ মজবুত, লৌহ নির্ম্মিত, বহু লোক একসঙ্গে পার হইতেছে। পরপারে আসিয়া অল্প 'চড়াই' অর্থাৎ উচ্চাভিমুখী রাস্তা; মিনিট দুই চলার পর সমতল ক্ষেত্রে আসিলাম। দূরে গঙ্গা ক্ষীণ-রেখায় মিলিয়া গিয়াছে কিন্তু তট প্রদেশ এখানে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বালুকাময় ও শুষ্ক। আমরা দক্ষিণদিক ধরিয়া চারি-দিকের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। আর মাইল দেড় হাঁটিতে পারিলে আমরা আজকের রাতটা শ্রীনগরে কাটাইয়া পরদিন প্রাতে বাসযোগে রুদ্রপ্রয়াগে পৌছাইতে পারিব। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বেশ আনন্দের সহিত চলিয়াছি; রাস্তা বেশ পরিষ্কার, চলিতে কোন কষ্ট নাই। কিন্তু হায়! এক

নূতন ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হইল! সমস্ত পথটি রুদ্ধ করিয়া জন চারেক লোক যাত্রীদিগের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একজনের হাতে পঞ্চাশ সি সি ইনজেক্সনের সিরিঞ্জ। ইহারা বিনা কলেরা ইনজেক্সনে কাহাকেও গাড়োয়াল রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না। ইনজেক্সনের ছুঁচ ফুটাইলে আমার বড় লাগে, মনটা খারাপ হইয়া গেল। আমার সঙ্গীদের মধ্যে মহারাজ ও নন্তে কলিকাতা হইতে রওনা হইবার অল্পদিন পূর্ব্বেই কলেরার ইনজেক্সন লইয়াছেন—জানাইলেন। কিন্তু উহারা ইনজেক্সন লওয়ার নিদর্শন পত্র ব্যতীত কোন কথা শুনিতে নারাজ। মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। একবার ভাবিলাম কলিকাতায় ফিরিয়া যাই আর বদরীকাশ্রমে যাইবার প্রয়োজন নাই। এখন কি করা উচিত, কলিকাতা হইতে হাজার মাইল দূরে আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া কি আজ যুক্তি সঙ্গত? অবশ্য বদরীনারায়ণ দর্শন করিতে যাইতেছি, ভগবানের দর্শন কি সহজেই হয়! কত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কত ত্যাগ স্বীকার করিয়া ভগবৎ দর্শন লাভ হয়। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মনে বেশ যেন সাহস পাইলাম। জামার হাতা গুটাইয়া ডাক্তারের নিকট দাঁড়াইলাম। মুহূর্ত্তের মধ্যে কাজ মিটিয়া গেল এবং একখানি নিদর্শন পত্র লিখিয়া আমাব হস্তে দিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। আমরা সকলে এবং অন্যান্য যাত্রীরাও এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইলাম।

বৈকাল পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে শ্রীনগরে (শ্রীক্ষেত্রে) প্রবেশ

করিলাম। ইহার দৃশ্য অতি মনোরম। দর্শন মাত্রেই বেশ আনন্দ বোধ হইল ; ইহা গাড়োয়াল রাজ্যের পুরাতন রাজধানী। এখানে কালীকম্বলীওয়ালার বিরাট ধর্ম্মশালা ও সদাব্রত রহিয়াছে। আমরা এখানেই আশ্রয় লইলাম। মহারাজের চেষ্টায় দ্বিতলে একখানি ঘর পাওয়া গেল। হরিদ্বার, হৃষিকেশ বা দেবপ্রয়াগের তুলনায় এখানকার আবহাওয়া গরম। গঙ্গার জল ছাড়া ধর্ম্মশালার ভিতর একটি জলের কল রহিয়াছে, জল তুলনায় গরম। যাত্রীর ভিড়ও বেজায়। গরমের জন্য ঘরের মধ্যে শয়ন অসম্ভব, জিনিষ পত্র ঘরে রাখিয়া বাহিরের বারাণ্ডায় সকলের বিছানা পাতা হইল। নীচের কলের জলে হাত মুখ ধুইয়া বিছানায় আসিয়া বসিলাম। এখান হইতে একদিকে রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া চামেলী (লালসাঙ্গা) এবং অপরদিকে কোটদ্বার পর্য্যন্ত যাত্রীবাহি বাস যাতায়াত করে। আমরা পরদিন সর্ব্বপ্রথম কেদারনাথ যাইব বলিয়া বাসে রুদ্রপ্রয়াগ যাওয়াই স্থির করিলাম। দেবপ্রয়াগ হইতে হাঁটাপথটি অলকানন্দার ধারে ধারে পৌনে পাঁচমাইল কলাসু, সতুইমাইল রাণীবাগ, সতুইমাইল কোপ্টা, একমাইল রামপুর, সচারি মাইল ভীলকেদার এবং সাড়ে তিনমাইল পরে এই শ্রীনগরে আসিয়া মিশিয়াছে। আমাদের এখানে অবস্থানের সময় অতি অল্প। এখানকার দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছুই দেখা হইল না। কমলেশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দির আসিবার পথেই পড়ে। গঙ্গার অপর পারে জনশূন্য নির্জ্জন স্থানে এক কালীর মন্দির। সম্মুখে গঙ্গার

ত্রিযুগী নারায়ণের মন্দির—পৃঃ ৪৫

স্রোত ও কলকল ধ্বনি এই পর্ব্বতসঙ্কুল নির্জ্জন বনভূমিকে মুখর করিয়া রাখিয়াছে। কালীর মন্দির দেখিয়া মনে পড়িল অষ্টম বর্ষীয় বালক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, গুরু শ্রীমৎ গোবিন্দপাদ কর্ত্তৃক বেদের ভাষ্য রচনা করিতে আদিষ্ট হইয়া বদরীকাশ্রমে যাইবার পথে এইস্থানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এই অঞ্চল তখন অত্যন্ত তান্ত্রিক প্রধান ছিল। কাপালিকগণ কালিকা মূর্ত্তির সম্মুখে রীতিমত নরবলি দিত। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের চেষ্টায় এইরূপ নরবলি প্রথা বন্ধ হয়। এ প্রায় ১২৫৬ বর্ষ পূর্ব্বের ঘটনা। আজকাল এপথে রাস্তাঘাট, ধর্ম্মশালা, চটি, প্রভৃতি হইয়াছে কিন্তু শঙ্করের যুগে এ সকল কিছুই ছিলনা। এখানে সরকারী হাঁসপাতাল ডাক ও টেলিগ্রাফ অফিস, দোকান, বাজার প্রভৃতি সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

এখন প্রায় রাত্রি দশটা, সঙ্গীরা আজ ক্লান্ত, স্বপাকের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মশালার ভিতর একটি বড় খাবারের দোকান হইতে নৈশ ভোজের ব্যবস্থা হইল। আমার আহারে রুচি না থাকায় কানন ভাই আমার জন্য এক গ্লাস ঘোল জোগাড় করিয়া আনিল।

আমাদের পার্শ্বেই একদল বিহারী যাত্রী বদরীকাশ্রম হইতে ফিরিয়া আজ সন্ধ্যায় এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দলে স্ত্রী, পুরুষ, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সবরকমই রহিয়াছে। কথা প্রসঙ্গে পথের বিবরণ বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিলাম। পথে লাঠি এবং ছাতা চাই-ই। আমার ছাতা আছে লাঠি নাই। ঐ

যাত্রীদের আমার লাঠির অভাব জানাইতে একজন তার লাঠি-গাছটি আমায় দিল। আমি মূল্য দিতে প্রস্তুত কিন্তু সে বিক্রয় করিতে রাজী নয়। তখন বিনামূল্যেই চাহিয়া লইলাম।

৩রা জ্যৈষ্ঠ অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পাঁচটার সময় আমরা ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ধর্ম্মশালা ত্যাগ করিলাম। প্রায় দুইমিনিট পথ হাঁটিয়া বাসের আড্ডায় আসিলাম। এখানে বুকিং অফিস আছে, টিকিট সঙ্গে সঙ্গেই পাইলাম। ভাড়া উচ্চশ্রেণীর দুইটাকা সাত আনা। গতকাল নাম লিখাইয়া রাখা হইয়াছিল। একখানি নির্দ্দিষ্ট বাসের উচ্চশ্রেণীতে আমরা সকলে বসিলাম এবং কুলিদের নিম্নশ্রেণীতে ব্যবস্থা করা হইল। মালপত্র কুলিদের জিম্মায়। কীর্ত্তিনগর হইতেই জয়রাম, মহারাজ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মোট বহন করিতেছে অবশ্য তাহার জন্য বাড়তি মজুরি সে পাইবে। পার্শ্বস্থ এক চায়ের দোকান হইতে বিস্কুট ও চায়ের দ্বারা প্রাতঃকালীন জলযোগ সারিয়া লইলাম। সাড়ে পাঁচটায় বাস ছাড়িয়া দিল। পূর্ব্ববৎ পর্ব্বত গাত্রস্থ চড়াই, উতরাই বহু পথ অতিক্রম করিয়া বাস পূর্ণবেগে ধাবিত হইল।

———

রুদ্রপ্রয়াগ

বাইশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রাতঃ ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে রুদ্রপ্রয়াগে আসিয়া পৌঁছাইলাম। পরপর আরও চার পাঁচখানি বাস আসিয়া থামিল। আমরা বাস হইতে নামিলাম। কুলিরা গাড়ীর ছাদ হইতে মাল নামাইতে লাগিল। এখানে একটি বড় অপ্রিয় ঘটনা ঘটিল। কুলিরা মাল নামাইলে দেখা গেল সকলের মাল ঠিকই আছে কিন্তু মহারাজের বিছানার বাণ্ডিল যাহাতে তাঁহার র‍্যাগ্ ও সমস্ত গরম পোষাক ছিল এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও কিছু অর্থাৎ কম্বল ইত্যাদি সমেত একটি গাঁটরি পাওয়া যাইতেছে না। চারিদিকে অনুসন্ধান করা গেল, কিছুতেই কিছু হইল না। মহারাজ শ্রীনগরের বাস সিণ্ডিকেট অফিসে অনুসন্ধান করিবার জন্য তার করিয়া দিলেন এবং বলবীরকে যাতায়াত ভাড়া দিয়া পরবর্ত্তী বাসে সেখানে খবর লইতে পাঠাইলেন। এই সমস্ত করিতে প্রায় তিন কোয়ারটার সময় কাটিয়া গেল। আমরা সকলেই ক্ষুণ্ণমনে অলকানন্দার পুল পার হইয়া অল্প বামদিকে আসিয়া কালীকম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালার দ্বিতলে একস্থানে আশ্রয় লইলাম। মহারাজের হাতে লাঠি এবং পরনে যাহা ছিল ইহা ব্যতীত আর কিছুই নাই, কিন্তু দেখা গেল ইহাতে তাঁহার কোনরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। এই ভাবটি সাধুজনোচিত বলিয়া মনে লাগিল। কানন নিজের

একখানি কম্বল পাতিয়া আমার পার্শ্বে মহারাজের স্থান করিয়া দিল। সকলেই যে যার কম্বল পাতিয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলাম। আমি একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া জয়রামকে দিয়া ডাক বাক্সে ফেলাইয়া দিলাম। সকলেই স্নান সারিয়া লইল। আমার কিন্তু অলকানন্দার ঘোলা জলে স্নানে রুচি হইল না। এখানে ঝরণা বা নলের জল নজবে পড়িল না। কানন বলিল— একটু আগেই সঙ্গম। সেখানে বেশ পরিষ্কার জল। আমি আর দেরী না করিয়া নন্তেকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া বামে প্রায় অর্দ্ধ মিনিটের পথ চলিবার পর সঙ্গমে আসিলাম। এখানে অলকানন্দা ও মন্দাকিনী মিলিত হইয়াছে। বহু পাথরের সিঁড়ি নামিয়া নিম্নে জলের নিকট আসিলাম। মন্দাকিনীর জল নির্ম্মল ও গতি প্রবল। স্নান ও তর্পণ শেষ করিয়া উপরে আসিয়া রুদ্রেশ্বর শিব দর্শন কবিয়া বাসায় ফিরিলাম। নন্তে ঘাটেই রহিয়া গেল।

ঐ স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। বাসেব আড্ডা হইতে অলকানন্দার সেতু পার হইয়া রাস্তা, বরাবর ধর্ম্মশালার সম্মুখ দিয়া সঙ্গম পর্য্যন্ত আসিয়াছে। পথ বেশ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। সঙ্গমের নিকট হইতে মন্দাকিনীর ধারে ধারে অপর একটী রাস্তা গিয়াছে, এটি কেদারের পথ। সঙ্গমের নিকট মন্দাকিনীর উপর স্থানীয় লোকদের পারাপারের জন্য একটি সেতু রহিয়াছে, উহা গাছের ছাল পাকাইয়া দড়ি করিয়া অতি সামান্য বস্তুর দ্বারা নির্ম্মিত। পাতলা পাতলা চেপ্টা বাঁশের বুনুনির উপর

দিয়া চলিতে হয়; ধরিবার জন্য দুই পার্শ্বে দড়ির রেলিং আছে। সঙ্গমের "ফটো" তুলিব বলিয়া আমি শ্যাম ও নন্তে আহারান্তে বিশ্রাম না করিয়া এখানে আসিলাম। ধীরে ধীরে সেতু পার হইলাম। মনে হয় যেন এই বুঝি ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। এই স্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ শুনা যায় যে, অমূর্ত্তরয়ার পুত্র রাজর্ষি গয় একসময়ে এক বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। যাচকদিগকে তিনি প্রত্যহ প্রচুর অন্ন ও দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিতেন। একদা দুইলক্ষ ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞে আসিয়া কোন কারণে ভৃগুবংশাবতংশ পরশুরামের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া রাক্ষসযোনী প্রাপ্ত হন। পরে তাঁহারা এই রুদ্রপ্রয়াগ সঙ্গমে স্নান করিয়া পুনরায় পূর্ব্বযোনী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানে মহর্ষি নারদ বহুকাল রুদ্রদেবের তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। ইহা অতি পবিত্র স্থান। আমার মনে হয় পূর্ব্বজন্মের কিছু সুকৃতি ও পিতৃপুরুষগণের শুভ আশীর্ব্বাদ আমার প্রতি ছিল, যাহার ফলে আজ আমি এই পবিত্র তীর্থে আসিবার সুযোগ পাইয়াছি। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে বাসায় ফিরিলাম। আমি আজ আর বাহির হইলাম না। ইত্যবসরে বলবীর, ফিরিয়া আসিল, মহারাজ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মাল পাওয়া গেলনা। প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস এখানে পাওয়া যায় এবং তাঁহারা দোকান বাজার ঘুরিয়া র‍্যাগ্ (বিলাতী কম্বল) কিনিয়া আনিলেন। আজ রাত্রে ডাল্ রুটি ও একটা আলুর তরকারীর ব্যবস্থা হইল। আগামী কল্য আমাদের হাঁটাপথে যাইতে হইবে।

এক ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী আমাদের পার্শ্বেই আশ্রয় লইয়াছেন, আমাদের মত যাত্রী। তিনি হৃষিকেশে যখন বাসের টিকিট কিনিতেছিলেন ঐ সময় পকেটমার তাঁব পকেট হইতে টাকার ব্যাগটি তুলিয়া লইয়াছে। ভদ্রলোকটি আজ বড়ই বিপন্ন। মহাতীর্থের পথেও আজকাল বেশ চোবের উপদ্রব হইতেছে। আমার অনুমান এই সকল নীচকার্য্য বিদেশী যাত্রীদের মধ্য হইতেই কেহ কেহ করে, স্থানীয় লোক নহে।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ রুদ্রপ্রয়াগ হইতে সকাল সাড়ে পাঁচটায় "জয় বাবা বদরী বিশাল" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ধর্ম্মশালা ত্যাগ করিলাম। আজ হইতে আমাদের প্রকৃত যাত্রা সুরু হইল, কারণ হরিদ্বার হইতে এই রুদ্রপ্রয়াগ পঁচানব্বই মাইল মোটর বাসে আসিয়াছি। এখান হইতে কেদারনাথ আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই পথে ডাণ্ডি, কাণ্ডি ও ঘোড়াছাড়া আর অন্য কোন যানবাহন পাওয়া যায় না। আমার বড়ই চিন্তা হইল কারণ প্রথম চটি 'ছাতোলী' পাঁচ মাইল দূরে। লোকমুখে শুনিয়াছি পাহাড়ীপথ, চড়াই উতরাই আছে, রাস্তা বড়ই দুর্গম। কলিকাতা হইতে যখন যাত্রা করি তখন ঘোড়া ভাড়া করিব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু শ্রীনগরে বাবা কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালায় কেদার বদরী হইতে প্রত্যাগত বহু বৃদ্ধ বৃদ্ধা যাত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া বুঝিলাম যে আমিও অনায়াসে যাইতে পারিব।

আমরা ছয়জন যাত্রী ও দুইজন কুলি মন্দাকিনীর ধারে ধারে পাহাড়ের গায়ে আঁকা পথ বাহিয়া চলিলাম। মন্দাকিনীর দুইপাড়

সুউচ্চ পর্ব্বত প্রাচীরে বেষ্টিত। আমাদেব দক্ষিণে অসংখ্য পর্ব্বত-চড়া উচ্চ শিরে দণ্ডায়মান। যতই অগ্রসর হইতেছি মনে হইতেছে যেন আমরা একই স্থানে দাঁড়াইয়া আছি। বামে মন্দাকিনী কোথাও ত্রিশ, কোথাও পঞ্চাশ আবাব কোথাও বা একশত ফুট নিম্নে প্রস্তর বিদীর্ণ করিয়া পাগলিনীব ন্যায় আপন মনে গর্জ্জন কবিতে করিতে অবিবাম গতিতে ছুটিতেছে। এক মাইল পথ হাঁটিবাব পব দেখিলাম পথে তো কোন কষ্ট নাই বরং আনন্দই বোধ হইতেছে। আমাদের সামনে পিছনে আরও অনেক যাত্রী। একজন বেলুড় মঠের সাধুব সহিত দেখা হইল তিনি মাত্র কেদাবনাথ দর্শন করিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে ফিরিয়া আসিতেছেন। বদরীনারায়ণ দর্শন ভাগ্যে হইল না কারণ তাঁহার পাকস্থলীতে ক্ষত (গ্যাসট্রিক আলসার) হইয়াছে। ভদ্রলোক বড় দুঃখিত, যেহেতু তিনি গত দশবৎসর যাবৎ এই কেদার-বদরী ভ্রমণ করিবেন বলিয়া আয়োজন করিয়াছিলেন। আপাততঃ তিনি রুদ্রপ্রয়াগে বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। এই ভাবে দুই তিন মাইল পার হইয়া যখন চার মাইলে আসিয়া পৌঁছিলাম তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া পরে বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হইল। আমরা আধভেজা অবস্থায় ছুটিতে ছুটিতে “ছাতোলীর” একটি চটিতে ঢুকিয়া পড়িলাম। ছাতা সকলের ছিল না। এক ছাতায় দুইজন করিয়া যাওয়ায় কিছু ভিজিতে হইল কিন্তু তাহাতে কাহারও স্বাস্থ্যহানি হয় নাই। এখানে রবার ক্লথ বাহির করিয়া কুলির পিঠের বিছানা ঢাকা দিলাম। পাঁচ মাইল যাওয়ার

দুশ্চিন্তা যেন ভোজবাজির মত মন হইতে একেবারে দূর হইয়া গেল। সঙ্গীরা দুই মাইল দূরে পরের চটিতে যাইয়া স্নান আহারের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই পাঁচ মাইল পথ যে হাঁটিয়া আসিয়াছি এই বোধটুকু তখন কাহারও হইল না।

বেলা সাড়ে নয়টায় "রামপুরে" আসিলাম। রামপুর একটি গাড়োয়ালী গ্রাম, এখানে অনেকগুলি চটি আছে। একটিতে আশ্রয় লইলাম। ভোজনাদির পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইয়া দুইটা পনের মিনিটে পুনরায় পরবর্ত্তী চটির উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। পরবর্ত্তী চটি "অগস্ত্যমুনি"। ইহার দূরত্ব সাড়ে চার মাইল।

চারটে বাজিয়া দশমিনিটে "অগস্ত্যমুনি" আসিলাম। পুরাণে বর্ণিত বিন্ধ্যপর্ব্বতের দর্পচূর্ণকারী মহামুনি অগস্ত্যের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম হইয়াছে "অগস্ত্যমুনি।" এখানে একটি মন্দিরে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে। স্থানটি সমতল ভূমির উপর, বেশ নির্জ্জন এবং মন্দাকিনীর তটে অবস্থিত। নদীর ধারে সমতল ক্ষেত্রের উপর এক পার্শ্বে একটি বিদ্যাভবন নির্ম্মিত হইতেছে, কয়েকজন লোক ইহার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে আসিল। বিদ্যাভবনের বিপরীত দিকে বৃহৎ সমতল ক্ষেত্র। ছেলেরা এখানে ফুটবলগ্রাউণ্ড করিয়াছে। চাঁদা সংগ্রহকারীদের নিকট শুনিলাম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ সমতলভূমি বিমানাবতরণ ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। এখানে ধর্ম্মশালা, পোষ্টঅফিস, অনেকগুলি চটি, নলের জলের ব্যবস্থা ও অল্পদূরে নদী রহিয়াছে। পথ বেশ সমতল—কোন কষ্ট-

মন্দাকিনী প্রবাহ—পৃঃ ৪৭

নাই। পোষ্টঅফিস সংলগ্ন এক চটিতে উঠিলাম, বসিতে না বসিতে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিল। মিনিট পনের জল হইল। বেশ ঠাণ্ডা, রাত্রে কম্বল ব্যবহারের প্রয়োজন হইল। ডাল, রুটি ও আলুর চক্কা আহারান্তে সকাল সকাল শুইয়া পড়িলাম; কারণ আমাদের ইচ্ছা যে আগামী কল্য কিছু প্রত্যুষে যাত্রা করিয়া কয়েক মাইল বেশী পথ হাঁটিব। আজ আমরা সকালে সাত মাইল ও বৈকালে সাড়ে চার মাইল পথ উত্তীর্ণ হইলাম।

গুপ্তকাশী

৫ই জ্যৈষ্ঠ "অগস্ত্যমুনি" হইতে প্রাতে পাঁচটায় রওনা হইলাম। তখনও আকাশে তারা দেখা যাইতেছে। বেলা এগারটার সময় "কুণ্ড" চটিতে আসিলাম। ইহা অগস্ত্যমুনি হইতে এগার মাইল দূরে অবস্থিত। অগস্ত্যমুনি হইতে "কুণ্ডর" মধ্যে যাত্রীদের থাকিবার স্থান আরো সওয়া দুই মাইল দূরে "সৌরী" গ্রামে। এখানে আটটী চটি আছে। "চন্দ্রপুরী" সৌরীর দেড়মাইল দূরে। ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ও চন্দ্রা মন্দাকিনীর সঙ্গম স্থল। এখানে শিবদূর্গার মন্দির, ভাল ভাল দোকান ও অনেকগুলি চটি আছে। আহারাদি শেষ করিয়া বেলা তিনটা পঁচিশ মিনিটের সময় সকলে জয় বাবা কেদারনাথজীকি জয়, জয় শ্রীগুরুমহারাজ কি জয়, নাম

উচ্চারণ করিতে করিতে গুপ্তকাশী অভিমুখে রওনা হইলাম। পথ দুইমাইল কিন্তু চড়াই। আজ এই প্রথম চড়াই পথে পা দিলাম। পৌনে একমাইল আসিবার পর জোর বৃষ্টি আসিল। একটি ছোট চটিতে ঢুকিয়া পড়িলাম, মিনিট পনের কুড়ি পরে জল একটু থামিলে আবার বাহির হইলাম। রাস্তা ক্রমেই উপরদিকে উঠিয়াছে। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতে লাগিল—পা অবশ হইয়া যাইবার উপক্রম, কিন্তু মনের অত্যুগ্র বাসনা আমাদের সকল কষ্ট অগ্রাহ্য করিল। প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতেছে, আমরা তখন চড়াই উঠিতেছি, ঘামে ভিতরের বনিয়ান ভিজিয়া গেল, বৃষ্টির জলে বাহিরের সার্ট ও খদ্দরের চাদর ভিজিল, এইরূপ অবস্থায় পাঁচটা পঁচিশ মিনিটে সকলে "গুপ্তকাশীতে" আসিয়া পৌছিলাম।

এখানে একটি চটিতে উঠিলাম। ইহা চারিতলা নূতন বাড়ী, বেশ ঝক্‌মক্ করিতেছে। এটি এ অঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় চটি; এক তলায় মালিকের দোকানঘর এবং বাকি তলাগুলি যাত্রীদের থাকিবার জন্য। নিকটেই শ্রীশ্রী৺বিশ্বেশ্বরের মন্দির। মন্দিরের সম্মুখভাগ দেখিবার মত নয়, ধর্ম্মশালা ও দোকান ঘরে ভর্ত্তি। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বামদিক ঘেঁষিয়া সামনে চারকোণা এক কুণ্ড। পিতলের গজমুখ দিয়া তাহার ভিতরে জল আসিতেছে। এখানে ইহাকে মণিকর্ণিকা কুণ্ড বলে। এই স্থানে স্নান, ভোজ্যদান ও গুপ্তদানের প্রথা আছে। এখানে ছোট দুইটী প্রাচান মন্দির আমাদের নজরে পড়িল।

একটির মধ্যে বিরাজ করিতেছে বিশ্বেশ্বরের অর্দ্ধ নারীশ্বর মূর্ত্তি। আমি স্বামীজি ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় পাণ্ডার সহিত বিশ্বেশ্বরের সন্ধ্যারতি দেখিতে যাইলাম।

গুপ্তকাশী নামের ইতিহাস সম্বন্ধে এইরূপ শুনা যায় যে, ইহা পঞ্চকাশীর এক কাশী এবং পাণ্ডবগণ বদরীকাশ্রম গমনকালে যখন এই স্থানে প্রথমে শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথের সহিত সাক্ষাৎ বাসনায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথ এই উগ্র তপস্বী পাণ্ডবগণকে দর্শন দিতে অনিচ্ছুক হইয়া নিজে গুপ্ত হইয়া যান। ইহার ফলে পাণ্ডবদিগকে বিফল মনোরথ হইয়া তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় কেদারাভিমুখে যাইতে হয়। শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথ এইরূপে গুপ্ত হওয়ায় তাঁহার পবিত্রধাম তদবধি গুপ্তকাশী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এখান হইতে বহুনিম্নে মন্দাকিনী এবং পরপারে উখীমঠ দেখা যায়। ঝরণার জল পাইপের মধ্য দিয়া আনিয়া যাত্রীদিগকে কলের জলের মত ব্যবহার করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে বরাবর এইরূপ প্রতি দেড় দুই মাইল অন্তর পাইপের জলের ব্যবস্থা আছে। আজ রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করিলাম। পাণ্ডার সহিত কথা কহিয়া বুঝিলাম যে দুই চারিদিন যাবৎ এখানে বৈকালে বৃষ্টি হইতেছে এবং সেই কারণে ঠাণ্ডাও বাড়িয়াছে। দেখিলাম শিশির মধ্যে নারিকেল তৈল জমিয়া গিয়াছে।

পার্ব্বত্য প্রদেশে যতই উপরে উঠা যায় জিনিষপত্র দুর্ম্মূল্য

ও দুষ্প্রাপ্য হয়। এখান হইতে জিনিষপত্রের দাম বাড়িতে সুরু হইল। কানন ভাই তো রাগিয়া আগুণ বলে "এখানে আর এক মিনিটও থাকিব না, বেটা চটিওয়ালা ডাকাত!"

৬ই জ্যৈষ্ঠ অতি প্রত্যুষে আমরা চটি ত্যাগ করিয়া যাইব ঠিক করিলাম কিন্তু প্রাতে এমন এক ঘটনা ঘটিল যে আমাদের রওনা হইতে দুই ঘণ্টা দেরী হইয়া গেল। দেখা গেল কানন ভাইয়ের "রিষ্টওয়াচ্" পাওয়া যাইতেছে না। গতরাত্রে শুইবার সময় ঐ ঘড়ি শ্যামের হাতে ছিল, সে ঘুমের ঘোরে উহা খুলিয়া মাথার কাছে হ্যাভারস্যাকে না রাখিয়া বিস্কুটের টিনের ভিতর রাখিয়াছিল। সকালে সে যে কি খোঁজাখুঁজি—কোথায় সকাল সকাল রওনা হইব তা নয় চটি হইতে নামিবার নামই নাই। ঘড়ি পাওয়া গেল বটে কিন্তু এই চটির উপর কানন ভাই অত্যন্ত চটিয়া গেল। বৃষ্টির জন্য নন্তে এখানে একটি ছাতা এগার টাকায় ক্রয় করিল।

নয়টা পঞ্চাশ মিনিটে পৌনে ছয় মাইল দূরে "মৈখণ্ডায়" আসিয়া পৌঁছাইলাম। এখানে চটিতে উঠিয়া আহারাদি শেষ করিয়া বৈকাল চারিটায় পুনরায় পরবর্ত্তী চটির উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। বেলা সাড়ে চারিটার সময়ে সওয়া এক মাইল দূরে "ফাটায়" পৌঁছাইলাম। ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, ভিজিতে ভিজিতে যাইব না—অতএব একটি নূতন তৈয়ারী চটিতে আশ্রয় লইলাম। আজ আমার ক্ষুধার তেজ নাই, রাত্রে কিছু খাইব না স্থির করিলাম এবং দলের আরও অনেকে রাত্রে না খাওয়াই

ঠিক করিলেন। রাতের খাওয়া না থাকায় কোন জিনিষপত্র কেনা দরকার বোধ করিলাম না কিন্তু কিছু না কিনিলে চটিওয়ালা পাছে অসন্তুষ্ট হয় এই নিমিত্ত কুলি দুইজনের মত আটা ও আলু আনিতে পাঠাইলাম। এই অল্প জিনিষের ফর্দ্দ শুনিয়া চটিওয়ালা তো রাগিয়া আগুণ, বলে "এত লোক আর জিনিষ এত কম! এত কম জিনিষ লইলে আমার চটিতে থাকিতে দিব না এবং চটি ছাড়িয়া না যাইলে দৈনিক চারিটাকা হিসাবে ভাড়া লাগিবে"। আমরা এই ভাড়া দিতে রাজি হওয়ায় চটিওয়ালার সমস্ত তর্জ্জন গর্জ্জন নিমেষে ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

ত্রিযুগী-নারায়ণ

৭ই জ্যৈষ্ঠ ভোর পাঁচটার সময় "ফাটা" ত্যাগ করিয়া দশ-মাইল দূরে "ত্রিযুগী-নারায়ণ" দর্শন উদ্দেশ্যে রওনা হইলাম। পাঁচমাইল দূরে "রামপুর", এ-পথে ইহা দ্বিতীয় রামপুর কারণ পূর্ব্বে আর এক রামপুর পার হইয়া আসিয়াছি। এই রামপুর হইতে রাস্তা দুইদিকে গিয়াছে। সোজা পথটি নিকটস্থ "শোন সঙ্গম" হইয়া গৌরীকুণ্ডের দিকে গিয়াছে এবং বামদিকের পথটি চারিমাইল চড়াই হইয়া "ত্রিযুগী-নারায়ণ" এবং তথা হইতে অবতরণ কালে বামে মোড় ফিরিয়া শোন-সঙ্গমে মিলিত হইয়াছে। আমি এই পথে একটি ঘোড়া ভাড়া করিলাম। রামপুর হইতে ত্রিযুগীর ভাড়া বার আনা মাইল হিসাবে চারিটাকা রফা হইল। মধ্যপথে আসিয়া

শ্রীশ্রী৺শাকম্বরী দেবীর মন্দির পাইলাম। এখানে দেবী দর্শন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও জলযোগ সমাপন করিয়া লইলাম।

দশটা পঞ্চাশমিনিটে "ত্রিযুগীতে" পৌঁছাইলাম। ত্রিযুগী নারায়ণের মন্দির ও নাটমন্দিব একলাগাও। নাটমন্দিরের মধ্য দিয়া মন্দিরদ্বার। মন্দির মধ্যে ক্ষীণ দীপালোকে চতুর্ভূজ নারায়ণ মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। নারায়ণেব উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবী এবং সম্মুখভাগে দক্ষিণে ও বামে দ্বারী জয় ও বিজয়কে দৃষ্টি-গোচর হয়। ইহা ব্যতীত কুবেরজী ও কালভৈরব মূর্ত্তি বর্ত্তমান। নাটমন্দিরে যজ্ঞকুণ্ড রহিয়াছে। সত্যযুগে হরগৌরীর বিবাহকালে যে যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল ইহাই সেই কুণ্ড, এখনও জ্বালিয়া রাখা হইয়াছে। মন্দিরের বাহিরে চারিটি জলের কুণ্ড আছে। একটিতে স্নান, একটিতে স্পর্শ, একটিতে আচমন ও অপরটিতে তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে হয়। কুণ্ডগুলির নাম যথাক্রমে ব্রহ্মকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড ও সরস্বতী কুণ্ড। অগ্নি কুণ্ডে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যবদ্বারা যাত্রীদিগকে আহুতি প্রদান করান। যাত্রীরা ঐ কুণ্ডে একখণ্ড করিয়া কাষ্ঠ প্রদান করেন। কাষ্ঠ ছোট বড় হিসাবে দুই পয়সা হইতে একটাকা পর্য্যন্ত মূল্য। পূজার খরচ খুবই অল্প। হিমালয়ের এই পর্ব্বত শৃঙ্গের উচ্চতা ১১০০০ ফুট।

আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন। মূহুর্মুহুঃ বৃষ্টি পড়িতেছে। আমরা ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপনান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইলাম।

গৌরীকুণ্ড

বেলা তিনটা ত্রিশ মিনিটে ত্রিযুগী ত্যাগ করিয়া উতরাই পথে শোন গঙ্গার সঙ্গমে আসিলাম, তারপব আড়াই মাইল চড়াই পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যা সাতটায় ত্রিযুগী হইতে পাঁচ মাইল দূবে "গৌরীকুণ্ডে" পৌঁছাইলাম। ধর্ম্মশালায় জায়গা পাওয়া গেল না, একটা চটিতেই আশ্রয় লইতে হইল। এখানে গৌরীদেবী তপস্যা করিয়াছিলেন। শিব এবং গৌরীদেবার পৃথক পৃথক মন্দির, একটি ঠাণ্ডা ও একটি গরম জলের কুণ্ড আছে। গরম কুণ্ডটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় আট বর্গ ফুট; গভীরতা ঠিক বুঝিলাম না কারণ জল এত গরম যে এক সিঁড়ি নামিয়া আবার উঠিয়া পড়িতে হইল। ডুব দিয়া স্নান করিতে পারিলাম না। পাশেই মন্দাকিনী তীব্রগতিতে বহিয়া যাইতেছে। জল এত ঠাণ্ডা যে নামিতে ইচ্ছা করে না। রাত্রে দারুণ শীত, গায়ে দিবার একখানা কম্বল আনিয়াছিলাম কোনোরকমে তাহাতেই রাত কাটাইলাম। শোনসঙ্গম হইতে চড়াই পথে আসিবার কালে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

———

কেদারনাথ

৮ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে আহারাদি শেষ করিয়া কেদারনাথের উদ্দেশে বেলা সাড়ে নয়টায় সঙ্গীরা সকলে রওনা হইলেন, আমার কিন্তু রওনা হইতে দেড় ঘণ্টা দেরী হইল কারণ পথ সাত মাইল এবং আগাগোড়া চড়াই। চড়াই পথ দেখিলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। একটা ঘোড়ার বন্দোবস্ত করিলাম। আজ আহারাদির পর আমি ও কানন গৌরীদেবীর মন্দির পার্শ্বে এক শিলাজিতের দোকানে আসিলাম। ইহা পাহাড়ের ঘাম বিশেষ, কাল আলকাতরার ন্যায় ঘন। গরম দুধের সহিত ব্যবহার করিলে মকরধ্বজ সেবনের ফল পাওয়া যায়। কাননভাই এক টাকায় এক ভরি ক্রয় করিল। ঘোড়াওয়ালা আহারাদি শেষ করিয়া এগারটার সময় আমার সহিত রওনা হইল। পৌণে চারিমাইল পথ অতিক্রম করিয়া "রামওয়াড়ায়" পৌছাইলাম। ইহাই কেদারের পথের শেষ চটি। এখানে কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালা ও দশটি চটি আছে। সঙ্গীদের সহিত এখানে দেখা হইল, সকলে চা পান করিয়া পুনরায় রওনা হইলাম। রামওয়াড়া হইতে কেদার পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোহর। চারিদিকে দুরারোহ উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণী দৃষ্টিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান—

"যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জ্জটির তপোবন দ্বারে।

তাহাদেরই গাত্র বাহিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উপরদিকে উঠিয়াছে, পাহাড়ী পথ। উপর হইতে খরস্রোতা মন্দাকিনী অনন্ত কল্লোলগীতে উল্লসিত রঙ্গে নিম্নাভিমুখে ছুটিতেছে।

দূর হইতে পর্ব্বত শিখরগুলি তুষারে সমাচ্ছন্ন দেখিতে পাইলাম। সম্মুখে বিস্তৃত তুষার ক্ষেত্র কি প্রাণমাতান দৃশ্য! অসীমের অনন্ত রূপরাশি অন্তরের অন্তঃস্থলে উপলব্ধি করিলাম—কি বিরাট! কি মহান! কি বৈচিত্রময়! কোথায় পড়িয়া রহিল দূরে সংসারের আবিলতা, জনাকীর্ণ নগরীর উন্মাদ কোলাহল—সব ভুলিয়া গেলাম! ভুলিয়া গেলাম কে আমি! কোথা আমি! কোথা হইতে আমার আগমন, কোথায়ই বা আমার শেষ! আবেগভবে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে বলিয়া উঠিলাম—

"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শতরূপে শতবার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।"

আবার শিলাবৃষ্টি সুরু হইল। ঘোড়ার পিঠে বসিয়া একহাতে লাগাম ও অপর হাতে ছাতা ধরিলাম। তুষার ক্রমশঃ বাড়িতেছে দেখিয়া ঘোড়াওয়ালা আমাকে ঘোড়া হইতে নামিতে বলিল। এ পথের ঘোড়াগুলি পাহাড়ী পথচলায় বেশ পটু। ঘোড়সওয়ারকে ঘোড়া চালাইবার জন্য বিশেষ কষ্ট করিতে হয়না। ঘোড়াওয়ালা সঙ্গেই থাকে। ঠাণ্ডা হাওয়া ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। পৌণে চারিটায় পুরী

কেদারে আসিয়া পৌঁছাইলাম, তুষার ধবল গিরিরাজি বামে রাখিয়া দক্ষিণে মন্দাকিনীর পুল পার হইলাম। বেলা মোটে পৌণে চারিটা কিন্তু আবহাওয়ায় সন্ধ্যা মনে হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বতমালা এবং একপার্শ্বে তুষার রিগলিত মন্দাকিনী সাঁই সাঁই করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। এখানে পর্ব্বতগাত্রে গাছপালার চিহ্ন নাই। কি ভীষণ ঠাণ্ডা, গায়ে গেঞ্জি, সার্ট, পুলোভার ও গরম কোট, পায়ে গরম মোজা ও মাথায় গরম টুপি, তবুও শীতে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছি।

ঘোড়াওয়ালার দাম মিটাইয়া দিয়া নিকটেই কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালার ম্যানেজারের নিকট ঘর প্রার্থনা করিলাম। ম্যানেজারের ব্যবহারটি ভাল লাগিল। সহানুভূতি সূচক বাক্যে এক কর্ম্মচারীকে ঘর খুলিয়া দিতে আদেশ দিলেন। দোতলায় একটি ঘর পাইলাম। ধর্ম্মশালার প্রবেশদ্বারে দেখি গুপ্তকাশীতে যে পাণ্ডার দ্বারা ভোজ্যদান করিয়াছিলাম সে, (ভগবতী প্রসাদ শুক্ল—কলিকাতার বেলুড়মঠ ও মিশনের পাণ্ডা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল) দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিবামাত্র যত্নপূর্ব্বক উপরে লইয়া গিয়া বসিতে বলিল এবং ছুটিয়া একখানা সুন্দর কম্বল আনিয়া তাড়াতাড়ি আমার গায়ে জড়াইয়া দিয়া বলিল আপনি বসুন, আমি বাহিরে অন্য বাবুদের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। ঘরের মেঝেতে চেটায়ের উপর ঘরজোড়া সতরঞ্চি ও তাহার উপর মোটা কার্পেট পাতা। কার্পেটে বসিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া জানালা খুলিয়া বরফের পর্ব্বতগুলি দেখিতেছি

এমন সময় শ্যাম এবং পরপর নন্তে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, স্বামীজি, কানন ও কুলি দুইজন আসিল। ভগবতী পাণ্ডা প্রত্যেককেই একখানি করিয়া কম্বল দিয়া যোড়হস্তে বলিল "আপনাদের যাহা কিছু দরকার বলুন আমি এখনই ব্যবস্থা করিতেছি।" আমাদের মধ্যে একজন গরম জল চাহিলেন। সে সঙ্গে সঙ্গে এক ঘটী গরম জল লইয়া আসিল। আমরা সকলেই সেই গরম জল পান করিলাম। সে বলিল "আপনারা জল খাইবেন না চা আনিতেছি।" আমরা ছয়জন ও কুলি দুজন, স্বামীজি চা খান না অতএব হিসাব করিয়া মোট সাত গ্লাস চা আনিয়া দিল। ঠাণ্ডায় প্রাণ অতিষ্ঠ, চা পান করিয়া যেন ধড়ে প্রাণ আসিল। ভগবতী, কেদারনাথজীর আরতির সময় হইলে আমাদের সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া আনিবে বলিয়া চলিয়া গেল। আমি নন্তেকে আমাদের পাণ্ডা, গিরিজাপ্রসাদ ও পান্নালাল শুক্লকে খবর দিতে পাঠাইলাম। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে পাণ্ডা বাজার গিয়াছে বাড়ী ফিরিলেই পাঠাইয়া দিবে। প্রায় দশমিনিটের মধ্যেই পান্নালাল শুক্ল আসিয়া হাজির। আমাদের কাহার কি প্রয়োজন জানিয়া লইয়া বলিল "আপনাদের ঐ একখানা কম্বলে এখানকার শীত যাইবে না, একখানা করিয়া লেপ ও চা লইয়া আসি।" আমাদের মধ্যে অনেকেই একবার চা পান করিয়াছেন বলিয়া আর চায়ের প্রয়োজন নাই জানাইল। মিনিট দশেকের মাথায় মোটা মোটা লেপ ও মস্ত এক কেটলি চা, কাপ, ডিশ ও

উচ্চারণ করিলে রেতকুণ্ডের জল হইতে বুদ্‌বুদ্‌ উত্থিত হয়। আমরা কিন্তু ইহার সত্যতা বিশেষ উপলব্ধি করিলাম না। শেষে উদককুণ্ডে আসিয়া মার্জ্জন করিলাম। এখানে একজন পুরোহিত বসিয়া আছেন, মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মার্জ্জন করাইয়া দেন। এই কুণ্ডে মার্জ্জন করিলে পুনর্জন্ম হয় না।

কেদারে ত্রিরাত্র বা একরাত্র বাস করিতে হয়, আমাদের একরাত্রই হইল। কেদারনাথের মন্দির পরিক্রমকালে পশ্চাৎ ও দক্ষিণভাগে তুষারস্তূপ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই কেদার শৃঙ্গের উচ্চতা ১১৫০০ ফুট, স্থানটি ছোটখাট উপত্যকা। কেদারনাথের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ইতিহাস এইরূপ পাওয়া যায় যে—দ্বাপর যুগের শেষে যখন কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ শেষ হয় তখন পাণ্ডবগণ গোত্রহত্যা, গুরুহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি পাপে নিজেদের কলুষিত ভাবিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। ইহাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বদরীকাশ্রমে গমন করিতে পরামর্শ দেন। পরে ভগবান বেদব্যাসও তাঁহাদিগকে পাপখণ্ডন ও মহাপ্রস্থানের উদ্দেশ্যে বদরীকাশ্রম যাইতে উপদেশ করেন। পাণ্ডবগণ ভগবান শঙ্করের দর্শন ও মুক্তি মানসে বদরীকাশ্রমের পথে কেদারে আসিয়া উপস্থিত হন। এইস্থান হইতে পূর্ব্বকালে কৈলাসস্থ শিবের দর্শন পাওয়া যাইত। দেবর্ষি নারদ আকাশ পথ হইতে পাণ্ডবগণকে দেখিয়া ভাবিলেন এই জ্ঞাতিহন্তা ও গুরুহন্তা পাপিষ্ঠগণ ভগবান শিবের দর্শনে আসিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"ভগবন! ঐ দেখুন পাপাত্মা পাণ্ডবগণ আপনার দর্শনের জন্য আসিতেছে, এইরূপ ব্যক্তি যদি অনায়াসে আপনার দর্শনে সক্ষম হয় তাহা হইলে আপনার মর্য্যাদা আর কি রহিল।" এই বলিয়া নারদ ঋষি সরিয়া পড়িলেন, ইহাতে ত্রিকালজ্ঞ শঙ্কর অন্তর্দ্ধান হইয়া মহিষমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া মাটী খুঁড়িয়া মহিষ মূর্ত্তির পশ্চাৎভাগ ধারণ করিলেন। ইহাতে ভগবান শিব ভীমসেনকে এইরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত এবং ঐ স্থানে তপস্যা করতঃ গোত্র হত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্ত হইবার উপদেশ দিলেন। মহিষ মূর্ত্তির পশ্চাৎভাগই কেদারনাথরূপে এখানে অবস্থিত।

পূজাদি শেষ করিয়া জলযোগ সমাপনান্তে এই পবিত্র কেদার ভূমিকে নমস্কার করিলাম এবং আমাদের যাত্রার অর্দ্ধভাগ সম্পূর্ণ হইল ভাবিয়া বিশেষ আনন্দবোধ করিতে লাগিলাম। এমন সময় আমাদের পাণ্ডাঠাকুর আসিয়া সুফল করাইয়া দিল। বেলা সাড়ে দশটায় আমরা কেদারনাথজীর জয়ধ্বনি করিতে করিতে নূতন উদ্যমে শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণের উদ্দেশে রওনা হইলাম। পথ এখন উতরাই সুরু হইল।

বেলা পৌনে একটায় রামওয়াড়ায় আসিলাম। আজ তিনটা নাগাদ এমন শিলাবৃষ্টি সুরু হইল যে বৈকালে রওনা হওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইল। রাত্রে অত্যন্ত শীত। ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষের নিকট হইতে কম্বল ধার করিতে বাধ্য হইলাম। এখানে কম্বল পাওয়া সহজ নহে।

প্রাতে পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটে রামওয়াড়া ত্যাগ করিয়া পৌনে নয়মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা এগারটায় "রামপুরে" আসিলাম। পথে গৌরীকুণ্ড পার হইয়া শোন প্রয়াগে স্নান সমাপন করিলাম। এই শোন প্রয়াগ বাসুকী ও মন্দাকিনীর সঙ্গম স্থল। বাসুকীর জল অতি স্বচ্ছ এবং স্রোত খুবই কম। সঙ্গমে স্নান করিয়া অতিশয় তৃপ্তি পাইলাম। শ্যাম ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেবল এই স্নান ব্যাপারে যোগ দিতে পারেন নাই। কারণ আমাদের পৌঁছাইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা দ্রুতগতিতে এই স্থানটি অতিক্রম করিয়া যান। কেদারনাথ হইতে এই পথটী ক্রমান্বয়ে উতরাই এবং সঙ্গম পার হইয়া রামপুরের কিছুদূর পর্য্যন্ত চড়াই পাওয়া যায়। স্নানান্তে আমরা পুল পার হইয়াই দক্ষিণে ত্রিযুগীর পথ ত্যাগ করিয়া বাম পার্শ্বস্থ পথে রামপুরে আসিয়া দেখি ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধর্ম্মশালায় তাঁর নিজের গায়ের চাদরখানি একতোলার একটি ঘরের মেঝের এক অংশে পাতিয়া জায়গা দখল করিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আজ এখানে নন্তে ও শ্যাম রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিল। বিশ্রামান্তে তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পুনঃ রওনা হইলাম। এখান হইতে মাছির উৎপাত আবার সুরু হইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছয়টা কুড়িমিনিটে সাড়ে ছয় মাইল দূরে "মৈখণ্ডায়" আসিলাম। কেদার যাইবার কালে গত ৬ই মে তারিখে আমরা এই মৈখণ্ডায় যে চটিতে মধ্যাহ্নে আহার কার্য্য

হিমালয়ে পুরী কেদার—পৃঃ ৫২

নিষ্পন্ন করিয়াছিলাম সেই চটির মালিক আমাদের দেখিয়া অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাব চটিতে অবস্থান করিবার জন্য আবেদন জানাইল। লোকটার ব্যবহার ভাল। এখানে চটিওয়ালাব প্রীতি আমাদের প্রতি একটু বেশী, কারণ উঠিবার পথে যখন আমরা আসি লোকটা টনসিলের কাশিতে কষ্ট পাইতেছিল। সে নিজে আমার কাছে ঔষধ চাহিয়াছিল। আমি কলিকাতা হইতে রওনা হইবার সময় এই পথের প্রয়োজনীয় কয়েকটী এলোপ্যাথিক ঔষধ আনিয়া ছিলাম। একটি পেপস্ বড়ি তাহাকে দেওয়াতে সে পরদিন খাইবে বলিয়া আর একটি বড়ি চাহিয়াছিল। একটি বাড়তি বড়ি তাহাকে দিয়াছিলাম। ইহা খাইয়া সে আরাম পাইয়াছিল। আমাদের সঙ্গী ভট্টাচার্য্য মহাশয়েব নিকট হোমিওপ্যাথী ঔষধ যথেষ্ট ছিল, তিনিও যেখানে যেমন প্রয়োজন দাতব্য করিলেন। এখানে দেবী মহিষমর্দ্দিনীর মন্দির এবং মন্দিরের বাহিরে প্রায় ত্রিশচল্লিশ ফুট দূরে অতি বৃহৎ এক দোলনা আছে। ঐ দোলনায় পর্ব্ব উপলক্ষে দেবীর ঝুলন যাত্রা সম্পন্ন হয়। পরদিন প্রাতে ছয়টার সময় মৈখণ্ডা ত্যাগ করিলাম।

উখীমঠ

১১ই জ্যৈষ্ঠ বেলা দশটা পনের মিনিটে সওয়া আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া উখীমঠে আসিলাম। যে পথ নালা হইতে বামদিকে উতরাই হইয়াছে সে পথ চামেলীতে গিয়াছে, আর দক্ষিণের পথটি যাহা আমরা ছাড়িয়া আসিলাম উহা গুপ্তকাশীতে গিয়াছে। মন্দাকিনীর সেতুপর্য্যন্ত রাস্তা উতরাই এবং সেতুপার হইয়াই প্রায় দেড়মাইল পথ উখীমঠ পর্য্যন্ত বিশেষ চড়াই। আমরা সর্ব্বদাই ধর্ম্মশালায় আশ্রয় পাইবার চেষ্টা করি, কারণ এখানে ঘর পাওয়া যায় কিন্তু চটিতে ঘর নাই কেবল দরজা জানালা-বিহীন বারাণ্ডা; শীতের দেশ, রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। চটিগুলি পর্ব্বতগাত্রের নিম্নভূভাগে কিন্তু ধর্ম্মশালা উপরে অর্থাৎ উচ্চভূভাগে। ম্যানেজারের অমনোযোগের দরুণ ঘর পাইতে আমাদের অবশ্য একটু দেরী হইল। আজ আমাদের দুইজন কুলির মধ্যে একজন বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়িল। দেখিলাম বহু দেরীতে অন্য কুলির দ্বারা সে মাল লইয়া আসিতেছে। আমরা তাহাকে বিশ্রাম দিবার জন্য বৈকালিক যাত্রা স্থগিত রাখিলাম। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার আমায় কিছু দেখিতে হইল না। কানন ও মহারাজ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যবস্থা করিলেন।

বৈকালে আমি, মহারাজ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় উখীমঠ বা

উখীমঠ দেখিয়া আসিলাম। এই মঠে কেদারনাথের রাওয়ালের (পুরোহিতের) বাসস্থান। শীতকালে কেদারনাথের পথ তুষারাবৃত হইলে পাণ্ডারা ও রাওয়ালজী এইস্থানে নামিয়া আসেন এবং এখান হইতে প্রায় ছয়মাস শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের উদ্দেশ্যে পূজা সম্পন্ন হয়। পুরাণে বর্ণিত বাণাসুরের কন্যা উষার নামানুযায়ী এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। ইহাই বাণাসুরের বাসস্থান ছিল। এই মন্দির মধ্যে রাওয়ালের গদি, উষাদেবীর মূর্ত্তি, পঞ্চকেদার মূর্ত্তি এবং অন্যান্য দেবতার মূর্ত্তিও আছে।

১২ই জ্যৈষ্ঠ সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা উখীমঠ হইতে রওনা হইয়া বেলা এগারটা পঁচিশমিনিটে সাড়ে আট মাইল চড়াই রাস্তা, আরোহণ করিয়া "পৌথীবাস" নামে একটি ছোট গ্রামে আসিলাম। এখানে একটি চটি বাছিয়া লইয়া মধ্যাহ্নের আহার ও বিশ্রাম লইলাম। পুনরায় সাড়ে তিনটায় যাত্রা সুরু হইল। এখান হইতে আঠার মাইল দূরে মধ্যমহেশ্বর বা দ্বিতীয় কেদারের পথ, অতি দুর্গম।

বৈকাল পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে আড়াই মাইল চড়াই পথ পার হইয়া "বানিয়াকুণ্ডে" আসিলাম। এ-পথে আমি ঘোড়া লইয়াছিলাম। সঙ্গীরা বলিয়াছিলেন যে এক মাইল বেশী হাঁটিয়া "চোপতায়" রাত্রিবাস করিবেন এবং পরদিন প্রাতে "চোপতা" হইতে তিনমাইল চড়াই অতিক্রম করিয়া "তুঙ্গনাথ" দর্শন করা যাইবে। কিন্তু আজ আমার ঘোড়া সঙ্গীদের পশ্চাতে ফেলিয়া আমাকে মিনিটকুড়ি আগাম বানিয়াকুণ্ডে

লইয়া আসিল। আমি সঙ্গীদের প্রত্যাশায় ঘোড়া হইতে নামিয়া কালীকম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালার রকের উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তুঙ্গনাথের দেড় দুইমাইল পথ চড়াই। সহযাত্রীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মহারাজ পরে কানন ও অপর সকলে আসিলেন; আলোচনান্তে এই স্থানেই থাকা স্থির হইল। শীতের প্রকোপ বেশী হওয়ায় রাত্রে কম্বল কর্জ্জ লইতে হইল। আজ সকাল থেকে উখীমঠ হইতে বরাবর চড়াই হাঁটিয়া ও পরদিন প্রাতে পুনরায় তুঙ্গনাথের চড়াই ভাঙ্গিতে আমার সঙ্গীদের মধ্যে অনেকেই কাতর হইয়া পড়িলেন। ঘোড়াওয়ালাকে বিদায় দিবার সময় মহারাজ ও কানন ব্যতীত সকলের জন্যই একটি করিয়া ঘোড়া আনিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল। প্রাতে পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে বদরীনারায়ণ স্মরণ পূর্ব্বক তুঙ্গনাথ অভিমুখে রওনা হইলাম। প্রত্যহ যাত্রা কালে মহারাজ আমাদের শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করাইয়া দিতেন।

তুঙ্গনাথ

১৩ই জ্যৈষ্ঠ বেলা আটটার সময় বানিয়াকুণ্ড হইতে তিন মাইল পথের মধ্যে দুই মাইল চড়াই অতিক্রম করিয়া সকলে "তুঙ্গনাথে" আসিলাম। এক মাইল দূরে চোপতার তেমাথা রাস্তা। দক্ষিণে একটি উতরাই পথ নামিয়া

"ভুলোকনা" গিয়াছে এবং একটি অপ্রসস্ত রাস্তা ক্রমোচ্চ হইয়া "তুঙ্গনাথে" উঠিয়াছে। এই দুই মাইল পথ হাঁটিতে যে পরিশ্রম হয় সমগ্র কেদার ও বদরীনারায়ণ ভ্রমণে সেরূপ হয় না। তবে কিন্তু মনে করিবেন্ না যেন ইহা অসাধ্য পথ। পথে উঠিতে উঠিতে সুদূর তুষার ধবল শৃঙ্গগুলি সুন্দরভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তুঙ্গনাথ শৃঙ্গটি উচ্চতায় ১৩০০০ ফুট। উপরে আসিয়া "আকাশ গঙ্গার" সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ইহা একটি প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ চৌবাচ্চা। এক পাশে একটি গোমুখ হইতে শীতল জল প্রবাহ কুণ্ডে পড়িতেছে। এই কুণ্ডে স্নান করিয়া "তুঙ্গনাথের" পূজাদি করিতে হয়। পুরোহিত ও পাণ্ডা পাওয়া যায়, তাহারাই বিধিমত সমস্ত কার্য্য করাইয়া দেয়। দক্ষিণা বা পূজার খরচ বিশেষ ব্যয় বহুল নহে। তুঙ্গনাথের মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত। প্রবেশ দ্বার তুলনায় ক্ষুদ্রায়তন। মস্তক বাঁচাইয়া প্রবেশ করা উচিত। মন্দির মধ্যে তুঙ্গনাথের মূর্ত্তি ও ইহার পশ্চাতে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি এবং নারায়ণের মূর্ত্তিও রহিয়াছে। বৌদ্ধ যুগের শেষে শঙ্করাচার্য্য মহাযোগী গোবিন্দ পাদের নিকট সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ মানসে বহির্গত হইয়া বদরীনারায়ণের পথে তুঙ্গনাথে আসিয়াছিলেন। তুঙ্গনাথের ব্রাহ্মণগণ আচার্য্য শঙ্করের সহিত বাক্যালাপ করিয়া ও তাঁহার প্রতিভায় পরিতৃপ্ত হইয়া আচার্য্যের স্মৃত্যর্থে এক প্রস্তর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তুঙ্গনাথের পশ্চাদ্ভাগে স্থাপন করেন। এই তুঙ্গনাথই তৃতীয় কেদার নামে অভিহিত।

মন্দিরের বাহিরে অন্যান্য দেব মন্দির রহিয়াছে। এগুলির পূজা প্রথমে করিয়া পরে তুঙ্গনাথের পূজা সমাপনপূর্ব্বক পাণ্ডার নিকট আশীর্ব্বাদ এবং সুফল লাভ করিলাম। পদ্ম পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে কেদার পাঁচটি অর্থাৎ পঞ্চকেদার। প্রথম কেদার "কেদারনাথ" যাহা ভীম কর্ত্তৃক ধৃত মহিষ মূর্ত্তির পশ্চাৎভাগ বা জঙ্ঘা, দ্বিতীয় কেদার "মহামহেশ্বর" নাভিপ্রদেশ বা মধ্যভাগ, তৃতীয় কেদার "তুঙ্গনাথ" বাহুপ্রদেশ, চতুর্থ কেদার—"রুদ্রনাথ" মুখভাগ এবং পঞ্চম কেদার—"কল্পেশ্বর"—ইহা মহাদেবের মস্তকের জটা বা কেশ ভাগ।

সুফলাদি সমাপনান্তে মন্দিরের কিছু নিম্নে আসিয়া এক দোকানে গরম পুরীর ব্যবস্থা করিয়া জলযোগ শেষ করিলাম। নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তুঙ্গনাথজীর জয়ধ্বনি করিয়া পুনরায় যাত্রা করিলাম। আড়াই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা এগারটা পঞ্চাশ মিনিটে "ভুলোকনায়" উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে এক চটিতে মধ্যাহ্ন ভোজন ও বিশ্রাম করিয়া বেলা তিনটায় রওনা হইয়া সওয়া ছয় মাইল উতরাই পথে নামিতে নামিতে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় "মণ্ডল" চটিতে আসিয়া পৌঁছাইলাম। যত পথ হাঁটিলাম তন্মধ্যে এই "মণ্ডলের" পথটি নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। স্থানটি বালখিল্য নদীর তীরে সমতলক্ষেত্রে অবস্থিত। কালী-কম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালায় আসিয়া আশ্রয় লইলাম। চটির সংখ্যা বহু। রাত্রি যাপনান্তে পরদিন প্রাতে ইষ্ট নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক "চামেলী" বা লালসাঙ্গা অভিমুখে চলিতে লাগিলাম।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে পাঁচটা দশ মিনিটে মণ্ডল হইতে চামেলীর পথে পাঁচমাইলের মাথায় "গোপেশ্বরে" আসিলাম। এখানে বৈতরণী কুণ্ডে স্নান করিয়া গোপেশ্বর শিবদর্শন করিতে হয়। মন্দিরটি প্রস্তর নির্ম্মিত। মন্দির প্রাঙ্গনে বেদীর উপর একটি সুবৃহৎ ত্রিশূল প্রোথিত রহিয়াছে। ত্রিশূল গাত্রে একখানি বৃহৎ পরশু (কুঠার) সংযোজিত দেখা গেল। এখানকার পাণ্ডার নিকট জানিতে পারিলাম যে ঐ ত্রিশূলখানি দেবাদিদেব মহাদেবের এবং পরশুখানি জমদগ্নি পুত্র পরশুরামের। এই ত্রিশূলগাত্রে দ্বাদশ শতাব্দীর মহারাজা অনেকমল্লের বিজয়বার্ত্তা খোদিত রহিয়াছে। গোপেশ্বর শিব ব্যতীত এখানে আরও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া আরও সওয়া দুই মাইল উতরাই পথ অতিক্রমের পর বেলা দশটায় "চামেলীতে" আসিলাম। এই উতরাই পথটি আসিতে বেশ কষ্ট হইয়াছিল, পথ যেন ফুরায় না।

আমরা রুদ্রপ্রয়াগ হইতে কেদারনাথ, মন্দাকিনীর তীর দিয়া ভ্রমণ করিয়াছি। এখন এই "চামেলীতে" অলকানন্দার তীরে আসিয়া পৌঁছাইলাম। ইহা হরিদ্বার বদরীনারায়ণ পথে অবস্থিত বা ইহাকে এক কথায় বলিতে পারা যায় কেদারবদরী, রুদ্রপ্রয়াগ এবং কর্ণপ্রয়াগ পথের মিলন স্থল। এখানে হাওয়া গরম, গঙ্গার জল ঠাণ্ডা কিন্তু ঘোলা, ঝরণা বা নলের পানীয়জলের ব্যবস্থা অপ্রচুর, নলের জল গরম, যাত্রীর ভীড় অত্যধিক, ধর্ম্মশালায় স্থানাভাব এবং চটির মালিক

যাত্রীব নিকট হইতে বেহিসাবে ভাড়া লইতেছে। এই জায়গা আমাদের ভাল লাগিল না। মহারাজের প্রস্তাবানুযায়ী জল ও স্থানাভাবে অন্নপাক বাসনা ত্যাগ করিয়া দোকান হইতে মিষ্টি ও পুরী আনাইয়া মধ্যাহ্নকালীন ভোজন শেষ করা হইল এবং যতশীঘ্র এই স্থান ত্যাগ করা যায় তাহার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। মালপত্র বাঁধাবাঁধি স্বরু করিলাম। এমন সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল—ঝড় উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও পড়িতে আরম্ভ কবিল। এই সকল অগ্রাহ্য করিয়া জয় শ্রীশ্রীবদরী-নাবায়ণকি জয় বলিয়া ধর্ম্মশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। ঘড়িতে তখন দুইটা ত্রিশ মিনিট।

ভিজিতে ভিজিতে তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে মাত্র দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "মঠ" চটিতে আশ্রয় লইলাম। এখানে বৃষ্টির জন্য যাত্রীর ভীড় যথেস্ট। অতি সংকীর্ণ স্থান, কোনওরকমে রাত্রিটা কাটাইলাম। এদিকে বৈকালের দিকে বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া আমাদের এ বেলার হাঁটায় প্রায়ই বিঘ্ন ঘটিতেছে। সকালের দিকে এইজন্য অধিক পথ হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে পাঁচটা পনের মিনিটে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া "মঠ" হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে প্রথমে একমাইল পার হইয়া "ছিন্‌কা" পরে আর এক মাইল আসিয়া "বৌলা" চটি। এখানে বিরহী ও অলকানন্দা মিলিত হইয়াছে। তারপর দুইমাইল আসিয়া "সিয়া"। পূর্ব্ব দুইটী চটি অপেক্ষা এ জায়গাটী বড়। আর এক মাইল দূরে "ধোবীঘাট,"

বিশেষ উল্লেখ যোগ্য স্থান নহে। ইহার দুই মাইল পরে "পিপলকুঠি" একটি ছোট খাট সহর, এখানে বহু চটি, ধর্ম্মশালা, নলের জল, দোকান এবং একটি ডাকবাঙ্গালা আছে। "পিপলকুঠি" পার হইয়া বৃষ্টির সম্মুখীন হইতে হইল। ভিজিতে ভিজিতে কোন রকমে "গরুড় গঙ্গার" ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। এ পথে ছাতা, লাঠি এবং বিছানা বাঁধিবার জন্য রবার ক্লথ বা অয়েলক্লথ বিশেষ প্রয়োজন। এখানে অলকানন্দা গরুড় গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। গরুড় গঙ্গার উপর একটি সেতু আছে, উহা পার হইয়া বদরীনারায়ণের পথ। সেতুর পার্শ্বেই গরুড়ের মন্দির। প্রবাদ আছে যে যদি কেহ এই গরুড় গঙ্গায় ডুব দিয়া গরুড়শীলা (নুড়ি) তুলিয়া রাখে তাহার সর্প ভয় থাকে না। গঙ্গার জল স্বচ্ছ ও স্রোতপূর্ণ এবং অগভীর। ইহা পানীয় জল হিসাবে ব্যবহৃত হয়, নলের জলও আছে। গঙ্গার স্রোত নানা আকারের নুড়ির উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে, দেখিতে অতিশয় মনোরম। আজ আমরা বৈকালে আর বাহির হইলাম না, পূর্ণ বিশ্রাম লইলাম।

গতকল্য একটী বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। গোপেশ্বর হইতে চামেলীর পথ কেবলই উতরাই, রাস্তা যেন শেষ হয় না। আমার ঐ পথে চলিতে চলিতে জ্বর আসিল। কাহাকেও কিছু জানাইলাম না, যেহেতু সকলে হয়ত চিন্তিত হইবেন। কোনো রকমে সঙ্গীদের সহিত চামেলীর ধর্ম্মশালায় উঠিলাম। ঘর পাওয়া গেল না, এখন উপায়—দেখিলাম

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের পূর্ব্বে আসিয়া ধর্ম্মশালার দ্বিতলের বারাণ্ডায় তাঁহার গায়ের চাদরখানি বিছাইয়া জায়গা দখল করিয়া রাখিয়াছেন। শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত, আমি তাঁর চাদরের এক পাশে শুইয়া পড়িলাম। খাওয়ার ঝোঁক একেবারে নাই কিন্তু শরীর যদি বসিয়া যায় এই আশঙ্কায় অল্প কিছু গ্রহণ করিলাম। বেশী সময় অপেক্ষা করা চলিবে না, কানন ভাইএর দ্বারা একটি ঘোড়া ব্যবস্থা করাইয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। জ্বর সারারাত ছিল, রাত্রের পথ্য হইয়াছিল দুধ। ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছে, কুলি বলবীরকে দিয়া পায়ে তৈল মালিশ করাইয়া লইলাম। এই কুলিটি বরাবরই বেশ ভদ্র ও অনুগত ছিল। চটির সকল যাত্রী রাত্রির অন্ধকারে নিদ্রামগ্ন হইল। আমাদের দলের সকলে ঘুমে অচেতন। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নাই—শুইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখি কি ভীষণ অন্ধকার, আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন। এ দেশের চটিগুলির দরজা বা জানালা নাই। বিশ্রামের সময় উন্মুক্ত আকাশ সর্ব্বদাই নজরে পড়ে। হঠাৎ চমকিয়া উঠিলাম—দেখি মহারাজ হস্তদ্বারা আমার কপাল স্পর্শ করিয়া তাপ অনুমান করিতেছেন। দেখিলাম দলের মধ্যে এই একটি লোকই সর্ব্ববিষয়ে নজর রাখেন। জ্বর শেষ রাত্রে ছাড়িল কিন্তু দুর্ব্বলতা বেশ অনুভব করিতেছি। প্রাতে মঠ হইতে গরুড় গঙ্গায় আসিবার সময় সকলের সহিত অতিকষ্টে হাঁটিয়া "ছিনকায়" চা ও দেশীয় খাদ্য পেরাগীর দ্বারা জলযোগ করিলাম। আজ গরুড় গঙ্গায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে

টইপার্টের দৃশ্য—৭০ ৫৮

দুধ ও ভাতের ব্যবস্থা হওয়ায় আমার পক্ষে পথ্যহিসাবে ভাল হইল। কারণ এদেশে কেবলমাত্র আটা, আতপচাউল, খোসাসমেত অড়হর, কাঁচামুগ, মসুর, কলাইয়ের ডাল, আলু, দুধ ও ঘৃত পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে রোগীর পথ্য দুধ ভিন্ন আমি আর কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। সারাদিন বিশ্রাম করিয়া শরীরটা বেশ সুস্থ বোধ হইল।

যোশীমঠ

১৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে পৌনে পাঁচটায় শ্রীভগবানের নাম স্মরণান্তর গরুড় গঙ্গা হইতে রওনা হইয়া বেলা সাড়ে বারটায় পনের মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "যোশীমঠে" আসিয়া পৌঁছাইলাম। গরুড় গঙ্গার সেতু হইতে পথ চড়াই, দুই মাইল দূরে "টঙ্গনি", স্থানটি ছোট; ধর্ম্মশালা, চটি, নলের জল ও ঝরণার জল আছে। পুনঃ তিন মাইল দূরে "পাতাল গঙ্গায়" আসিলাম। ইহার নিকটবর্ত্তী দুই মাইল পথ উতরাই কিন্তু অত্যন্ত খারাপ, অনবরত ধ্বসিয়া যায়। প্রতিবৎসর পাহাড় ধ্বসিয়া এই পথটি বন্ধ হইয়া যায় এবং পুনরায় নূতন করিয়া তৈয়ার করিতে হয়। এখানে অনবরত লোক খাটিতেছে, ধর্ম্মশালা নাই, খান কতক চটি ও দোকান আছে। বিস্তীর্ণ নুড়ি রাজ্যের ভিতর দিয়া পাতাল গঙ্গা এই স্থানে সূক্ষ্মধারায় তীরবেগে বহিয়া যাইতেছে,

জল স্বচ্ছ ও শীতল। পাতাল গঙ্গার সেতু পার হইয়া পথ চড়াই। সওয়া দুই মাইল দূরে "গোপাল কুঠী"—এখানে চটি, ডাকবাঙ্গালা এবং ঝরণার জল আছে। পথ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতেছে। গোপাল কুঠী হইতে আড়াই মাইল দূরে "কুমার চটিতে" আসিলাম, এখানে ধর্ম্মশালাব বারাণ্ডায় মিনিট পনের বিশ্রাম লইয়া, দুগ্ধপা্ন এবং গুড় ও ছোলাভাজা সহযোগে জলযোগ করিলাম। এই স্থানটি কর্ম্মনাশা নদীর তারে অবস্থিত। দৃশ্য মনোরম। চটির নিকটবর্ত্তী পথ সমতল। এখানে ধর্ম্মশালা, পোষ্ট অফিস, নলের ও ঝরণার জল এবং অনেক চটি আছে। ইহার দুই মাইল উপরে "খনোটী," স্থানটি ছোট,—মাত্র দু তিন খানা চটি ও ঝরণার জল আছে। ইহার এক মাইল দূরে "ঝড়কুলায়"—চারি পাঁচ খানি চটি বর্ত্তমান কিন্তু এখানে পানীয় জলের বড় অভাব। রুদ্র প্রয়াগ হইতে কেদারনাথ পর্য্যন্ত যেরূপ অপর্য্যাপ্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে, বদরী-নারায়ণের পথে সেরূপ নাই। ঝড়কুলার দেড়মাইল দূরে "সিংহধার।" ইহা সমতল ক্ষেত্র ও বেশ রমণীয় স্থান। এখানে ছয়খানি চটি আছে। পথ ক্রমোচ্চ হইয়া দেড়মাইল দূরে "যোশীমঠে" আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

"যোশীমঠ" একটি ছোটখাট পাহাড়ী নগর। দোকান, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, ধর্ম্মশালা এবং ডাকবাঙ্গালা প্রভৃতি আছে। বেশ জমকালো স্থান। আজ আহারাদির পর. বিশ্রামান্তে বৈকালে সকলে বেড়াইতে বাহির হইলাম।

চাঁমেলী হইতে যে রাস্তা আসিয়া এখানে কালীকম্বলী-ওয়ালার ধর্ম্মশালার পাশ দিয়া গিয়াছে তাহার দক্ষিণস্থ পর্ব্বতোপরি ভূভাগ জ্যোতির্ধাম এবং ইহাই ভগবান শঙ্করাচার্য্যের উত্তর ধাম, এখানেই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্মঠ অবস্থিত। শঙ্করাচার্য্যের চারি ধামের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধাম। মিনিট তিন চার হাঁটিবার পর আমরা শঙ্করাচার্য্যের মঠে আসিলাম। বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর এই মঠ স্থাপিত। চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। প্রথমে এক মন্দিরের সম্মুখে আসিলাম, ইহা পূর্ণগিরি দেবীর মন্দির, দেবীদর্শন করিয়া এখান হইতে অল্প দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া একটি কুটিরের মধ্যে দেখিলাম ধূনি জ্বলিতেছে এবং তাহার পার্শ্বে জটাজুটধারী ভস্মাচ্ছাদিত সবলকায় এক সাধু উপবিষ্ট, বয়স অনুমান পঞ্চান্ন কি ষাট হইবে। আমরা দ্বারে দাঁড়াইবামাত্র তিনি মধুরবাক্যে আমাদিগকে ভিতরে বসিতে বলিলেন, অল্পক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমরা সাধুর নিকট বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলাম। এক বৃক্ষের নিকট আসিলাম। গাছটি দেখিতে দূর হইতে বটগাছের ন্যায়, মোটা গুঁড়ি,পাতাগুলি ছোট। ইহার নিম্নে একটি ক্ষুদ্র গৃহ বা মন্দির, মধ্যে "জ্যোতিশ্বর" শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য এইস্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। মহাদেব দর্শনান্তে পুনঃ পূর্ণগিরিদেবীর মন্দিরের নিকট আসিলাম। গিরিদেবীর মন্দিরের দক্ষিণে উচ্চভূভাগে বৃহৎ দ্বিতল মঠবাড়ী। আমাদের আর ঐ মঠবাড়ীতে যাইতে ইচ্ছা হইল না।

কারণ সকলেই বাসায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত। এমন সময়ে তথা হইতে একজন সন্ন্যাসী আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন 'আসুন মঠ দর্শন করিয়া যান।' সাধুব সম্মানার্থে আমরা মঠের দ্বিতলে উপস্থিত হইলাম।

সুবৃহৎ বারাণ্ডা ও পর পর অনেকগুলি ঘর। মাঝখানের একটি ঘরে মহন্তর গদি। ঘরটি " আসবাবপত্রে সুন্দরভাবে সজ্জিত। উত্তরাখণ্ডের ধর্ম্মপীঠ জ্যোতির্মঠের বর্ত্তমান বৈদিক ধর্ম্মসম্রাট হইতেছেন জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্কবাচার্য্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী। মহন্তই এখানে শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হন। ঘরের বাহিরে বামদিকে দুইজন সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন, একজন আমাদিগকে বসিতে বলিয়া পার্শ্বে কার্পেট পাতা স্থান দেখাইয়া দিলেন, সকলে সেখানে গিয়া বসিলাম। সন্ন্যাসী প্রত্যেকের পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। আমার গলায় মালা দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত বুঝিয়া কথা প্রসঙ্গে শুনাইয়া দিলেন যে শঙ্করাচার্য্য চৈতন্যদেব অপেক্ষা বড় সাধু, যেহেতু তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী ও অষ্টম বর্ষ বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, পক্ষান্তরে চৈতন্যদেবের দুই বিবাহ। আমার মত অজ্ঞানীর পক্ষে ধর্ম্মজগতের উচ্চ নীচ বিচার করা ধৃষ্টতা বিবেচনায় তাঁহার কথার প্রতিবাদ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না। আমরা এখানে "কল্যাণপথ" নামে একখানি করিয়া পুস্তিকা পাইলাম। মূল্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন ইহার দাম লওয়া হয় না। এখানে অন্যান্য মঠ বা

ঠাকুরবাড়ীর ন্যায় পূজা, দক্ষিণা, ভেট বা দর্শনী দেওয়ার বালাই নাই—সব নিষিদ্ধ। প্রায় সন্ধ্যা হইল আমরা সন্ন্যাসীজীকে বিদায় অভিবাদন জানাইয়া নামিয়া আসিলাম। ধর্ম্মশালার নিকটে আসিয়া মহারাজ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যোশীমঠ দেখা হয় নাই, দেখিয়া আসি। আমিও তাঁহাদের সঙ্গ লইলাম। অন্যান্য সকলে ধর্ম্মশালায় গিয়া নৈশ ভোজনের ব্যবস্থায় উদ্যোগী হইলেন। বদরীকাশ্রমের পথটি চামেলী হইতে আসিয়া এখানে কালীকম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালার পাশ দিয়া বামদিকে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একটি যোশীমঠের ভিতর দিয়া বামে নিম্নাভিমুখী হইয়া বদরীনারায়ণের দিকে গিয়াছে এবং অপরটি সোজা কৈলাস ও মানস সরোবরের দিকে গিয়াছে। এই বামদিকের সাধারণ পথ হইতে কিছু নিম্নের বাড়ীটি যোশীমঠ নামে বিখ্যাত। ইহার উচ্চতা ৬১০০ ফুট। মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীনৃসিংহ ও শ্রীশ্রীবদরী-নারায়ণের প্রতিনিধি মূর্ত্তি রহিয়াছে। শীতকালে যখন ছয়মাস বদরীকাশ্রমের পথ তুষারাচ্ছন্ন থাকে তখন বদরীনারায়ণের পূজা এখান হইতেই হয় এবং পূজারী বা রাওয়াল এখানে অবস্থান করেন।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ—প্রাতে চারিটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে যথাবিধি ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া যোশীমঠের ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমেই দুই মাইল পথ বিশেষ উতরাই (যাহা ফিরিবার সময় চড়াইয়ে দাঁড়ায়) অতিক্রম করিয়া "বিষ্ণু প্রয়াগে" আসিলাম। এখানে বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম, জলের

কি ভীষণ বেগ, নামিয়া স্নান করিতে সাহস হয় না। আমি এখানে জলস্পর্শ করিলাম। ঘাটের পার্শ্বেই বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত, ইহার বাহার বিশেষ নাই। পুরাকালে নারদ ঋষি এইখানে জয় বিজয় পর্ব্বতোপরি তপস্যা করিয়া সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছিলেন; চটির সংখ্যা অল্প এবং ঝরণার জল পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিষ্ণুমন্দির হইতে রাস্তা ক্রমশঃ চড়াই হইতে লাগিল। এক মাইল পথ হাঁটিবার পর "বলদেও" চটিতে আসিলাম, জায়গাটি বিশেষ ছোট, আমরা দাঁড়াইলাম না; এখানে দুইখানি চটি ও ধর্ম্মশালা এবং পানীয় জলের ঝরণা আছে। পুনঃ তিন মাইল সমতল পথ চলার পর অলকানন্দার তীরে অবস্থিত "ঘাট" চটিতে আসিলাম। এখানে দশখানি চটি এবং পানীয়স্বরূপ ব্যবহৃত হয় নদীর জল। আরও দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "পাণ্ডুকেশ্বরে" পৌঁছাইলাম। তখন বেলা দশটা পঞ্চাশ মিনিট। আজ সকাল হইতে মাত্র আট মাইল চলা হইল, গতকাল সকালে পনের মাইল হাঁটা হইয়াছিল, তুলনায় কিছুই নয়। আজ এত বেলায় আর হাঁটিতে ভাল লাগিতেছিল না, অগত্যা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। এই উত্তরাখণ্ডের পথে অধিকাংশ ধর্ম্মশালাই দ্বিতল এবং চটি দ্বিতল ও একতল দুইই দেখা গেল। প্রাচীর ও মেঝে মাটীর, চাল টিনের বা পাথরের টালির দ্বারা প্রস্তুত। ধর্ম্মশালায় দরজা ও জানালা আছে কিন্তু চটির দরজা ও জানালার বালাই নাই। শীত এদিকে প্রচণ্ড। ধর্ম্মশালার ঘর দখল করাই ভাল।

শ্রীশ্রী৺তুঙ্গনাথের মন্দির—পৃঃ ৮১

সাধারণের পক্ষে এই ঘর সংগ্রহ করা কঠিন কারণ অধিকাংশ স্থলে ম্যানেজার বিনা অনুরোধ পত্রে ঘরের চাবি খুলিয়া দেন না। ঘরের সামনে বারাণ্ডার দরজা বা জানালা নাই। বারাণ্ডায় থাকার জন্য অনুমতির দরকার হয় না। ঘরের মেঝেতে পাতিবার জন্য বড় সতরঞ্জি ধর্ম্মশালার তরফ হইতে দেওয়া হয় এবং যেখানে শীত প্রচণ্ড সেখানে কম্বল কর্জ্জ পাওয়া যায়—কোনো খরচ দিতে হয় না।

পাণ্ডুকেশ্বর একখানি বড় গ্রাম। এখানে পুরাকালে মহাভারতে বর্ণিত পাণ্ডুরাজা তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন স্বর্গ হইতে এক কাঞ্চন নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি আনিয়া এখানে স্থাপন করেন। স্নানান্তে আমি ও মহারাজ দর্শনেচ্ছায় মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। ধর্ম্মশালা হইতে ইহা মাত্র অর্দ্ধমিনিটের পথ। মন্দিরের প্রবেশদ্বার পার হইয়া ভিতরে দুইটি প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির। তন্মধ্যে একটি যোগবদরীর মন্দির। শুনিয়াছিলাম এইখানে তাম্রশাসন পত্র আছে। পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "বর্ত্তমানে উহা বদরীকাশ্রমে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, এখানে নাই।" আমরা ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া আহারাদি সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সকলের ইচ্ছা আজ বৈকালে সকাল সকাল ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইয়া কিছু বেশী পথ যাইতে হইবে, কারণ আজ সকালে হাঁটা কিছু কম হইয়াছে। এখানে শীত বেশী, ঘরের ভিতর কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া এই

সকল কথাবার্ত্তা চলিতেছে আর বাহিরে আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টি সুরু হইল। অগত্যা আমাদের আজ এই পাণ্ডুকেশ্বরেই থাকিতে হইল। এইভাবে বৃষ্টির জন্য প্রায় তিন চারিটি বৈকাল আমাদের নষ্ট হইয়াছে।

—···—

বদরীকাশ্রম

১৮ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে জয় বদরীনারায়ণকি জয় গাহিতে গাহিতে পাণ্ডুকেশ্বর হইতে বদরীকাশ্রমাভিমুখে রওনা হইলাম। যে বদরীকাশ্রম দেখিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আজ বিশ দিন কলিকাতা ছাড়িয়াছি, যাহার দূরত্ব প্রায় বারশত পঞ্চাশ মাইল—এখন তাহা মাত্র সাড়ে এগার মাইল দূরে অবস্থিত। এইটুকু পথ যাইতে পারিলেই মনের চঞ্চলতা স্থির হইয়া যায়। আজ কি আনন্দের দিন! পুণ্যক্ষেত্র বদরীকাশ্রমে চির ঈপ্সিত বদরীনারায়ণের দর্শন পাইব! নারায়ণের শ্রীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিব! জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পাপরাশি বিদূরিত হইবে! যুক্ত করে, ভক্তি গদ্ গদ্ কণ্ঠে উচ্চারণ করিলাম—

"দীনং হীনং সেবয়া দৈবগত্যা,
পাপৈস্তাপৈঃ পুরিতং মে শরীরম্।
লোভাক্রান্তং শোকমোহাদিবিদ্ধং,
কারুণ্যাব্ধে পাহি মাং বাসুদেব।"

এক মাইল দূরে "বিনায়ক" চটি পাইলাম, এখানে আমরা দাঁড়াইলাম না। পুনঃ দেড়মাইল দূরে আসিয়া "লামবাগড়" চটিতে আসিলাম। এখানে ধর্ম্মশালা ও খানকয়েক চটি এবং নলের জলের ব্যবস্থা আছে, প্রথমেই প্রবেশ পথের দক্ষিণে একখানি বড় খাবারের দোকান নজরে পড়িল। রাস্তার ধারে একখানি টেবিলের পার্শ্বে বেঞ্চি ও লোহার চেয়ার পাতা রহিয়াছে। যাত্রীরা এখানে চা পান ও জলযোগ করিয়া গন্তব্যস্থলে চলিয়া যাইতেছে। আমরাও এক একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গে নিজে.দর তৈয়ারী মোটা মোটা রুটি ছিল, আর ঐ দোকান হইতে আলুর দম, মুগের নাড়ু ও পেয়ালা করিয়া চা লইয়া বেশ আরামে প্রাতঃকালীন জলখাবারের পালা শেষ করিলাম। এপথে এই প্রথম দোকানে চায়ের পেয়ালার ব্যবস্থা ও নানারকম ভাজি ও মিষ্টি খাবার এবং টেবিল চেয়ার দেখিলাম। সাধারণ দোকানে পিতলের উপর এনামেল করা গ্লাসে চা দেয়; চা এ রাস্তায় প্রতি চটিতেই পাওয়া যায়। জলযোগ সারিয়া এখান হইতে আমরা রওনা হইলাম। পথ ক্রমশঃ চড়াই, চার মাইল চড়াই পথ হাঁটার পর "হনুমান" চটিতে আসিলাম, ইহাই বদরীকাশ্রমের শেষ চটি। গন্তব্যস্থলে পৌঁছাইতে আর মাত্র মাইল পাঁচেক বাকি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইবার জন্য এক দোকানের সম্মুখে বসিলাম। সঙ্গীদের মধ্যে কেহ কেহ দুধ পান করিলেন। এখানে শাল পাতা পাওয়া যায়না, তাহার পরিবর্ত্তে দোকানীরা ভূর্জ্জপত্র ব্যবহার করে।

এই স্থানকে শ্রীরামের ভক্ত হনুমানের তপস্যা ক্ষেত্র বলে। এখানে মহাবীর হনুমানের একটি মন্দির, খানকয়েক চটি, দোকান ও একটিমাত্র ধর্ম্মশালা দেখিলাম, নলের জলের কোন ব্যবস্থা নাই নিকটেই নির্ম্মল জলের ঝরণা আছে। আমি খাবারের দোকান হইতে জল চাহিয়া পান করিলাম। এদেশের লোকজনের আচার ব্যবহার ভদ্রজনোচিত। ক্রমেই বেলা বাড়িতেছে, আমাদের মুটেরা এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বদরীকাশ্রমে পৌঁছাইতে বেলা হইবে বুঝিয়া এখান হইতেই কিছু পুরী, মুগের লাড়ু ও তরকারী (তরকারী এখানে পূরীর সহিত বিনামূল্যে নহে) মধ্যাহ্নের মোটামুটি জলযোগ স্বরূপ কিনিয়া লইলাম। দোকানদারের নিকট হইতে একখানি ভূর্জ্জপত্র নমুনা রাখিব বলিয়া চাহিয়া লইলাম। ইহা দেখিতে রঙিন রেশমের ছিটের মত। বরাবর জানিতাম ইহা বৃক্ষবিশেষের পাতা কিন্তু এখন দেখিতেছি ভূর্জ্জবৃক্ষের ছাল। পাটে পাটে একসঙ্গে দশবারখানা থাকে। মুটেরা আসিল এবং আমরাও অগ্রসর হইলাম।

পথ বরাবর পর্ব্বতগাত্র বহিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া উচ্চ হইতে উচ্চে চড়াই হইয়া চলিয়াছে। ইহা তিন হইতে চারিফুট চওড়া। বামে বহু নিম্নে গঙ্গা (অলকানন্দা) আপন চঞ্চল গতিতে ধাবিত হইতেছে এবং দক্ষিণে গিরিশ্রেণী উন্নতশিরে অটল অচলভাবে দণ্ডায়মান। চির বৃক্ষই এ পথে অধিক কিন্তু ক্রমে ক্রমে পর্ব্বত গাত্রের উভয় পার্শ্বই অর্থাৎ নদীর এপার ওপার দুইই বৃক্ষশূন্য

হইল ও অনতিদূরে তুষার ধবল পর্ব্বতগুলি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে দেখা গেল নদীবক্ষ তুষার ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে অথচ নিম্নভাগে গঙ্গা চঞ্চলগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। নদীবক্ষের তুষারক্ষেত্রের উপর দিয়া পরপারে হাঁটিয়া যাওয়া কিছু শক্ত বলিয়া মনে হইল না। আমরা ক্রমান্বয়ে আগাইয়া চলিয়াছি। কিছুদূর আসিয়া এক বৃহৎ তুষার ক্ষেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। লোক চলাচলে ক্ষেত্রের উপর পথরেখা চিহ্নিত হইয়াছে। এই তুষারক্ষেত্র দক্ষিণে পর্ব্বতশিখর এবং বামে নদীগর্ভের পরপার পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে ধীর পদচারণায় ইহার উপর চলিতে লাগিলাম। ইহার দৃশ্য যেমন নয়ন তৃপ্তিকর তেমনি আনন্দবর্দ্ধক। কিছুক্ষণ হাঁটার পর তুষারমার্গের শেষ সীমায় আসিলাম। দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের কিয়দংশ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, পথ কোন দিকে বোঝা যায়না, সামনে নুড়ি ও তুষার কোনরকমে পার হইয়া পাঁচ সাত মিনিট চলার পর উপরে মোড়ের মাথায় একখানি ঘর দেখিলাম। ইহা লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছি এমন সময় দেখা গেল কয়েকজন লোক এক ব্যক্তিকে বিছানায় শায়িত অবস্থায় শয্যার প্রান্তভাগ ধরিয়া নামাইয়া লইয়া আসিতেছে। তাহাদিগের বেশভূষা দেখিয়া এই প্রদেশের লোক বলিয়া মনে হইল। সেই ঘরখানিতে আসিয়া দেখিলাম ইহা চায়ের দোকান এবং সামনে বসিয়া কথা প্রসঙ্গে বুঝিলাম যে ঐ লোকগুলি ডোমশ্রেণীর এবং যে লোকটিকে লইয়া যাইতেছে সে এই পথেরই

যাত্রী। লোকটি দোকানের পার্শ্বে বিশ্রাম করিতেছিল .কিন্তু মারা গিয়াছে। বদরীনারায়ণের মন্দির এখান হইতে মাত্র দেড় মাইল। লোকটি এতদূর আসিয়াও দর্শন পাইল না কেবল এই কথাই মনে হইতে লাগিল। এখন বেলা সাড়ে দশটা মুটেরা এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই, ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় দোকান হইতে এক এক গ্লাস করিয়া চা লইয়া আমাদের সহিত যে খাবার ছিল তাহার দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল। মুটেরাও আসিয়া পৌঁছাইল।

কেদার ও বদরীনারায়ণের পথে জল ও হাওয়া সর্ব্বদা ঠাণ্ডা, পথ চলিবার কালে পরিশ্রান্ত হইলেই রাস্তার ধারে বহু প্রস্তর বিক্ষিপ্ত আছে যেন প্রকৃতি পরিশ্রান্তের জন্য আসন বিছাইয়া রাখিয়াছেন, একটির উপর দুই মিনিট বসিলেই বেশ শ্রান্তি দূর হয়, পুনঃ নূতন উদ্যমে হাঁটিতে পারা যায়। পথে কত লোক আমাদের মত বদরীনারায়ণ দর্শন করিতে যাইতেছে, চড়াই আরোহণ-শ্রমে ক্লান্ত, পা আর বহেনা, মুখে কি করুণ ভাব ও "জয় বদরী বিশাল কি জয়" ধ্বনি শুনিয়া মনে হইল এ পথের কি মহিমা, যে কখনও ভগবানের নাম করিতে সময় পায় না বা করে না সেও আজ প্রাণ খুলিয়া নাম উচ্চারণ করিতেছে। কিন্তু যাহারা দর্শনান্তে উতরাই পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে তাহাদেরও নিরানন্দ ও মলিন বদন। ইষ্টদর্শনে আনন্দের ভাবই আমি ইহাদের কাছে আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিরসতার কারণ কিছু বুঝিলাম না। আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের মহারাজ ও কানন ভাইকে ইহার

কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু সমাধান বিশেষ হইল না। আমি লক্ষ্য করিলাম কেবল গৃহী তীর্থকামীদের দীর্ঘ পথশ্রমে ও একঘেয়ে অনভ্যস্থ আহার গ্রহণের ফলে বদনমণ্ডলে শ্রান্তি ও কাতর ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমরা কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইতেছি, এখন পথ বিশেষ চড়াইও নহে এবং উতরাইও নহে। আর প্রায় মাইল দেড়েক চলিতে পারিলেই "বদরীনাথ" পুরীধামে পৌঁছাইব। এমন সময়ে নন্তে (সুনীল কুমার দে) সোৎসাহে বলিয়া উঠিল ঐ বদরীকাশ্রম দেখা যাইতেছে। আমিও সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম সত্যই অলকানন্দার পরপারে নারায়ণ পর্ব্বতগাত্রে খেলাঘরের মত এখানে সেখানে টিনের চাল, মন্দিরের চূড়া প্রভৃতি রহিয়াছে। মনে হইল আমরা যেন কত শীঘ্র আসিয়া পড়িলাম। এখন হইতে পথ কিছুটা উতরাই, নর-পর্ব্বতের পাদমূলে আসিয়া অলকানন্দার বক্ষঃস্থিত সুদৃঢ় লৌহসেতু অতিক্রম করিয়া পরপারে বদরীকাশ্রমে আসিয়া পৌঁছাইলাম। মন আজ আনন্দে ভরপূর। কলিকাতায় বসিয়া পথের দূরত্ব ভাবিতাম আর কেবল মনে হইত বদরীকাশ্রমে যাওয়া আমার পক্ষে কি সম্ভব হইবে? কারণ কতদিনে ফেরা যায় ও পাহাড়ী পথ অতিক্রমের কঠোরতা কিরূপ, বন্ধু, বান্ধব বা বয়স্থ যে কোন লোকের সহিত আলোচনা করিয়াছি কেহ কোন সৎ উত্তর বা উৎসাহ দিতে পারে নাই এবং জানা শুনা দুএকজন যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহাদের বর্ণনা শুনিলে আর যাইবার উৎসাহ আসে না। আজ কিন্তু সেই অজানার প্রত্যক্ষ-

সমাধান হইল ভাবিয়া মনে মনে আনন্দ ও গর্ব্ব বোধ করিলাম। এখন বেলা বারোটা আকাশে রৌদ্রের তেজ নাই, মেঘলা। তুষার ধবল নারায়ণ পর্ব্বতশিখর হইতে ঝরণা বহিয়া আসিয়া সেতুর নিকটে অলকানন্দার সহিত মিশিয়াছে। আমরা ঐ ঝরণা পার হইয়া দক্ষিণ দিকস্থ পথে আগাইয়া চলিলাম। উদ্দেশ্য এইবার ধর্ম্মশালা বা পাণ্ডারাড়ীর সন্ধান করা। এমন সময় জন দুই তিন গাড়োয়াল গভর্ণমেণ্টের চাপরাশি আমাদের পথ রোধ করিল। কারণ দৈনিক কত যাত্রী বদরীকাশ্রমে আসে তাহারা ইহার একটা হিসাব রাখিতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অগ্রিম আমাদের নাম ধাম ইত্যাদি লিখাইয়া রাখায় আর আমাদের দাঁড়াইতে হইলনা। এইস্থানে ডাকঘর ও বাসসিণ্ডিকেটের কার্য্যালয়। আমরা ধর্ম্মশালার দিকে চলিলাম, এখান হইতে মিনিট দেড়েকের পথ। ম্যানেজারের অনুপস্থিতির জন্য তথায় স্থান সংগ্রহ হইল না, পাণ্ডাবাড়ীর দিকে ফিরিলাম, পাণ্ডাঠাকুর অর্থাৎ পণ্ডিত শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্ট—যিনি আমার বদরীকাশ্রমের পাণ্ডা। ধর্ম্মশালা হইতে পাণ্ডাঠাকুরের বাড়ীতে আসিবার পথেই ধীরেন ভট্টের সহিত দেখা হইল। তিনি পূর্ব্ব হইতেই তাঁর ছড়িদার মারফৎ আমার নাম ও ঠিকানা পাইয়াছিলেন বুঝিলাম। পরিচিত হইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। তিনি যত্ন পূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার আলয়ে আনিয়া একখানি এক তোলার বড় ঘর ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া দিলেন ও মেঝেতে পাতিবার জন্য বড় সতরঞ্জি এবং কার্পেট ব্যবস্থা করিলেন আর এক গোছা চিঠি
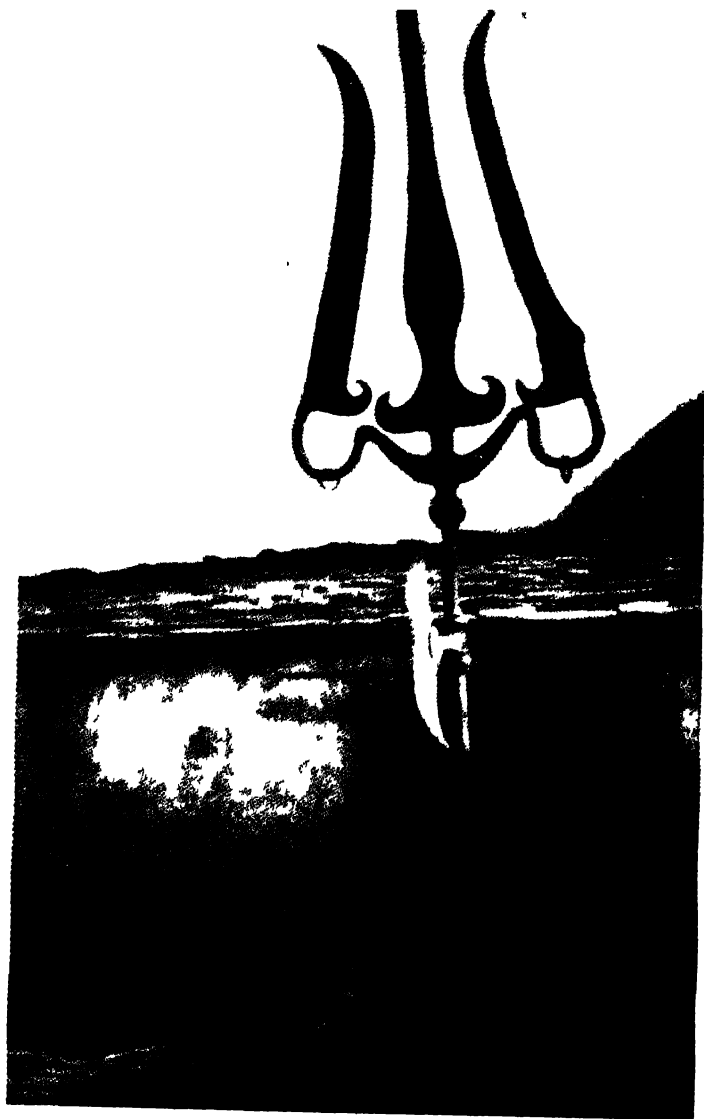
আনিয়া আমাদিগকে দিলেন যদি ইহার মধ্যে আমাদের কোন পরিচিতের চিঠি থাকে, নস্তের একখানি চিঠি পাওয়া গেল। আমরা "নারায়ণ" দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করায় পাণ্ডাজী বলিলেন বেলা একটা আন্দাজ মন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়া যায়। ইহা শুনিয়া আমরা তাড়াতাড়ি মোটঘাট কুলির নিকট রাখিয়া শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণের মন্দিরাভিমুখে ছুটিলাম। আমাদের বাসা হইতে মন্দির প্রায় দুই মিনিটের পথ। উভয় পার্শ্ব নানান জিনিষের দোকানে পরিপূর্ণ।

আজ এ বেলা দেব দর্শন হইল না, আসিতে দেরী হইয়াছে, দ্বার রুদ্ধ। যাহা হউক রাত্রে আরতি দর্শন করিব মন্দিরের সম্মুখেই অলকানন্দার কূলে আসিতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি নামিয়া দক্ষিণে তপ্তকুণ্ড অবস্থিত। এই তপ্তকুণ্ডে স্নানের সকলেরই বাসনা। কুণ্ডপার্শ্বেই পুরোহিত বসিয়া রহিয়াছেন। বহুযাত্রী স্নান করিতেছে। মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক স্নান সমাপন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। জল এত ঠাণ্ডা যে স্নান করিবার ইচ্ছা আমার ছিলনা কেবল উষ্ণকুণ্ডের নামে স্নানে বাহির হইয়াছিলাম। কুণ্ডের জল এত উষ্ণ, যে অসহ্য বোধ হইল, এই উষ্ণতা সময় সময় কমে বাড়ে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় বার ফুট, প্রস্থে দশ ফুট ও গভীরতায় সাড়ে চারি ফুট হইবে, নামিবার সিঁড়ি আগাগোড়া বেলে পাথরে বাঁধান এবং নামিতে বা উঠিতে কোন অসুবিধা হয় না। এই কুণ্ড অতি পবিত্র, ইহাতে স্নান ও দানাদি করিলে মনের পাপ দূর হয়। এমন কি আমার মনে

হয় ভক্তিহীনেরও অন্তরে ভক্তি ও শান্তি আসে এবং ধর্ম্মে বিশ্বাস জন্মে।

এই তপ্তকুণ্ডের ইতিহাস হইতেছে যে সত্যযুগে একসময়ে অগ্নিদেব সর্ব্বভূক হওয়ায় তেজশূন্য হইয়া পড়েন। এরূপ অবস্থায় তিনি ক্ষুণ্ণমনে তাঁহার তেজহীনতার বিষয় বহু দেবতা ও ঋষির নিকট কাতর ভাবে ব্যক্ত করেন। তাঁহারা তাঁহাকে দুঃখিত না হইয়া লুপ্ততেজ পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম বদরীকাশ্রমে গিয়া তপস্যা করিতে পরামর্শ দেন। নরনারায়ণ পর্ব্বতে পবিত্র অলকানন্দাকুলে আসিয়া অগ্নিদেব ভক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিদাতা বদরীনারায়ণের চরণ সেবায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কালে ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "অগ্নি আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার পূর্ব্বতেজ আমার বরে পুনঃ প্রাপ্ত হইলে, আর কখনও ইহা লোপ পাইবে না, কারণ প্রথমতঃ তুমি যেস্থানে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিয়াছ, ঋষি নর-নারায়ণ সে স্থানে তপস্যা করিয়া সহস্রকবচ রাক্ষসকে বধ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ মার্কণ্ডেয় ঋষি এইস্থানেই তপস্যা করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ করিয়াছিলেন। অতএব হে অগ্নি! তুমি এইস্থানে তৃতীয়বার তপস্যা করিয়া পরম পবিত্র ও তেজশালী হইয়াছ। আজ হইতে এইস্থান তোমার তপস্যার জন্য বহ্নিক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে আর তুমি এইস্থানে তপ্তোদক প্রবাহরূপে জগৎবাসীর মঙ্গলের নিমিত্ত বিরাজ করিবে। পাপীতাপী তোমার উষ্ণোদক-স্পর্শে সর্ব্বপাপশূন্য হইবে।"

· বেলা অনেক হইয়াছে, বাসায় আসিয়া যে যার বিছানা পাতিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আজ ক্ষুধার তেজ নাই। সর্ব্ববাদি-সম্মত ভোটে এবেলা রন্ধনাদি নিষ্প্রয়োজন বোধ হইল, মুটেরাও আমাদের সঙ্গে একমত। রাত্রে যাহা হউক চেষ্টা করা যাইবে এইরূপ আলোচনা চলিতেছে, এমন সময় পাণ্ডাঠাকুর (ধীরেনভট্ট) আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিলেন। প্রসাদে মোটা মালপোয়া, বড় মুগের লাড্ডু প্রভৃতি মিষ্টান্ন ভাগে যথেষ্ট পরিমাণে পাইলাম। প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। পাণ্ডাঠাকুর আসিয়া বলিলেন তাঁহার ছেলে রক্তামাশায় বড়ই ভুগিতেছে আমাদের কাছে কোন ঔষধ আছে কি না? আমার নিকট সালফাগুয়ানিডিন ট্যাবলেট ছিল; গোটা আষ্টেক দিলাম।

সারাদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, আব-হাওয়া বিশেষ ঠাণ্ডা, তবে কেদারের তুলনায় উনিশ বিশ কম। এখানকার উচ্চতা ১০৫০০ ফুট। সন্ধ্যায় সকলে শ্রীশ্রী৺বদরী-নারায়ণের সন্ধ্যারতি দেখিতে বাহির হইলাম। বাসা হইতে মন্দির পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বে অসংখ্য দোকান, বিশেষ করিয়া দুই তিন খানি মৃগ-চর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম ও চামর সজ্জিত দোকান মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল কিন্তু দেব দর্শনের বাসনা পূর্ণ না করিয়া দোকানের দিকে নজর দিব না স্থির করিলাম। মন্দির প্রবেশের প্রধান ফটক হইতে যাত্রীর ভীড়, নাটমন্দিরের দরজায় আসিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইতে হইল। রক্ষীরা ভীড় নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, ভক্তেরা প্রাণখুলিয়া ভজন গাহিতেছে। ভজনের সুরে মনের মধ্যে

ভক্তিভাবের সঞ্চার হইল। মনে হইল আমার মত গোঁয়ার লোকের এ আবার কি পরিবর্ত্তন। ইচ্ছা হইল ভজনে যোগদান করিয়া আমিও চীৎকার করি, কিন্তু হিন্দীতে ভজন চলিতেছে। যোগ দিতে পারিতেছি না, কি করি? তখন গুরুদত্ত নামই জপিতে আরম্ভ করিলাম। মিনিট পাঁচেকের পর দরজা খুলিল, এক্ষণে মূল মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। যাত্রীদিগকে প্রায় পনেরফুট দূর হইতে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে দেওয়া হয়। সম্মুখে একজন পূজারী একখানি অতি বৃহৎ কানা উঁচু থালা লইয়া মধ্য পথ রোধ করিয়া বসিয়া পূজা, প্রণামী ও প্রসাদ বিতরণ কার্য্য গম্ভীরভাবে চালাইতেছেন। বামে বহির্গমনের পথ। আজ নারায়ণের শৃঙ্গার বেশ হইয়াছে। আরতি দর্শন, পূজা দেওয়া ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ঐ বামদিকস্থ পথ দিয়া বাহিরে আসিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। পরিক্রম পথেই শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীদেবী, শঙ্করাচার্য্য মূর্ত্তি, ঘণ্টাকর্ণ, মহাবীর হনুমান, ঘুরিয়া আসিয়া শ্রীমন্দিরের প্রবেশ পথে গরুড়মূর্ত্তি এবং লক্ষ্মীমন্দিরের বামে ভোগমণ্ডপ দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম। আজ রাত্রে মহারাজ ও কানন ভাইয়ের চেষ্টায় আমরা সকলে একপাকে যাহা হইল সানন্দে তাহাই গ্রহণ করিলাম কিন্তু উদ্যোক্তাগণকে ভিজা কাঠের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। মোটা মোটা ভিজা কাঠ এবং দামও বেশী, এখানে রৌদ্রই উঠেনা কাঠ শুকাইবে কিরূপে? রাত্রে বেজায় শীত। পাণ্ডাঠাকুর প্রত্যেককে একখানি করিয়া লেপ দিলেন।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সাতটার সময় পাণ্ডাঠাকুরের সহিত তীর্থকার্য্য করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই নারায়ণ পর্ব্বতগাত্রে অলকানন্দার কূলে তপ্তকুণ্ডে স্নান ও গুপ্তদান ইত্যাদি সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মকপালাভিমুখে চলিলাম। তপ্তকুণ্ডে স্নানান্তে দুচার ধাপ উপরে উঠিবার কালে পাণ্ডাজী দক্ষিণস্থ এক দরজা খুলিয়া তপ্তকুণ্ডের মূল উৎস দেখাইলেন। এখান হইতে তপ্তবারি প্রবাহিত হইয়া বাহিরের কুণ্ডে সঞ্চিত হইতেছে। বাসা হইতে বাহির হইয়া পাণ্ডাঠাকুরের নির্দ্দেশমত এক মেওয়ার দোকান হইতে পূজার দ্রব্যাদি ক্রয়কালে একটি পূর্ণাবয়ব শুষ্ক নারিকেলের শাঁস লওয়া হইয়াছিল। গুপ্তদান কালে পাণ্ডা-ঠাকুরের অজ্ঞাতে ইহারই মধ্যে মাণিক্য, মুদ্রা বা অঙ্গুরী প্রবেশ করাইয়া ঢাকা দিয়া দান করা হইল। পূর্ব্বে এই গুপ্তদান সম্বন্ধে জ্ঞান ছিলনা। পথে নারায়ণের অন্নভোগ ক্রয় করিয়া ঋষিগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম স্থলে ব্রহ্মকপালে ঐ ভোগ দ্বারা পিতৃকুলের, মাতৃকুলের, পূর্ব্বপুরুষগণের এবং আত্মীয় স্বজনগণের নাম ও গোত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ভক্তিভরে তাঁহাদের আত্মার বৈকুণ্ঠ কামনা করিয়া পিণ্ডদান করিলাম। এখানে পিণ্ডদান কার্য্য পৃথক পুরোহিত সম্পন্ন করিয়া দিলেন; তীর্থপাণ্ডা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু করিলেন না। জল হইতে প্রায় তিন ফুট উচ্চে বৃহৎ এক প্রস্তর খণ্ডোপরি বসিয়া পিণ্ডদান কার্য্য চলিতেছে। ইহা ভারতীয় হিন্দুদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিতৃকার্য্য করিবার স্থান, ইহাপেক্ষা পবিত্র এবং পুণ্যময় স্থান আর ইহজগতে নাই। এই ব্রহ্মকপালির-

ঐতিহাসিক তথ্য এইরূপ জানা যায় যে—এক সময়ে চতুরানন ব্রহ্মা আত্মজা বাগ্‌দেবী সরস্বতীর প্রতি নিজ সৃষ্ট কামের প্রভাব দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার এই কুৎসিত প্রবৃত্তি শূলপাণি সহ্য করিলেন না। তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া নিজ মুষ্টিবদ্ধ করিলেন। মুহূর্ত্তে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করিল, তাঁহার মুষ্টিমধ্যস্থ ব্রহ্মার মস্তক দৃঢ় সংযত হইল। ইহা তিনি কোন প্রকারে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। অবশেষে এই বদরীকারণ্যে আসিয়া তপ্তকুণ্ডে স্নান পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। হস্তস্থিত মস্তকের খুলিও স্খলিত হইল। শ্রীভগবান শিব এইরূপে শান্তিলাভ করিয়া কৈলাসধামে প্রয়ান করিলেন। যে স্থানে ব্রহ্মার ঐ কপাল (মাথার খুলি) পতিত হয়, ঐ স্থানই ব্রহ্মকপাল নামে প্রসিদ্ধ। এইস্থানে পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদিতে পিতৃলোক পরম প্রীত হন। তাঁহাদের অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। অলকানন্দা ও ঋষিগঙ্গার সঙ্গম হইতে অল্প উপরে শ্রীশ্রী৺আদি-কেদারেশ্বর দর্শনীয়।

পিণ্ডদানান্তে তপ্তকুণ্ড সন্নিকটে নারদাদি পঞ্চশিলা দর্শন করিতে হয়। প্রথমে—"নারদশিলা," অলকানন্দার দক্ষিণকূলে, মহর্ষি নারদ বহুবর্ষ এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তদবধি ইহা নারদশিলা নামে বিখ্যাত, এখানে একটি কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে ভক্তিভরে স্নান করিলে মানব সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়। দ্বিতীয় —"নৃসিংহশিলা," শ্রীভগবান নারায়ণ সত্যযুগে ভক্ত প্রহ্লাদের

পিতা হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার পূর্ব্বে এখানে তপস্যা করিয়া শক্তিসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তৃতায়—"বরাহশিলা," চাক্ষুষ মন্বন্তরে শ্রীভগবান বিষ্ণু এই স্থানে তপস্যা করিয়া শ্রীবরাহমূর্ত্তি ধারণ করতঃ হিরণ্যাক্ষ বধ করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করেন। তদবধি এই স্থান পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। চতুর্থ—"গরুড়শীলা," এখানে বিনতানন্দন গরুড় তপস্যার জন্য বহুকাল যাপন করিয়াছিলেন, এই স্থানই গরুড়শিলা নামে পরিচিত। পঞ্চম—"মার্কণ্ডেয় শিলা," এই স্থান মহামুনি মার্কণ্ডেয় তাঁহার সাধন ভজনের ক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। ইহা অতীব পুণ্যভূমি।

প্রায় এগারটার সময় বাসায় ফিরিলাম। আজ মধ্যাহ্নে পাণ্ডাঠাকুর তাঁহার শ্রীশ্রী৺গোপালজীর এবং বদরীনারায়ণের ভোগ আমাদিগকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করাইলেন। আমি একবার শ্রীশ্রী৺গয়াধামে এবং শ্রীশ্রী৺অযোধ্যাধামে গিয়াছিলাম। তথাকার পাণ্ডাদের অভদ্রোচিত ব্যবহারে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হই। তদবধি কোন তীর্থক্ষেত্রে যাইলেই সাধ্যমত পাণ্ডার সঙ্গবর্জ্জনে সচেষ্ট থাকি। পাণ্ডার প্রতি বড়ই অভক্তি কিন্তু আজ এই সুদূর বদরীকারণ্যে, শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টের, যাত্রীর প্রতি সস্নেহ ব্যবহার এবং সুখ সুবিধা বিধান ব্যবস্থা দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। তীর্থ-পাণ্ডার প্রতি আমি বরাবর যে অশ্রদ্ধা পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, তাহা আজ এই পূণ্যভূমির মধুময় স্পর্শে আসিয়া

আমার পাপ অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইল। এতদিন পাণ্ডাকে 'তুমি' সম্বোধন করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আজ হইতে 'আপনি' বলিলাম। এইরূপ পাণ্ডার উপর নির্ভর করা যায়। অগ্ত আমাদের ভ্রমণের উদ্দেশ্য সফল হইল, আরও প্রায় কুড়িমাইল উপরে যাইতে পারিলে মাতামূর্ত্তি, মুচকুন্দ গুহা, ব্যাস আশ্রম, বসুধারা ও পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান প্রভৃতি স্থানগুলি দর্শন হয়। পাণ্ডাজীকে পথের বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "ঐ স্থানে বরফ এখনও রহিয়াছে, পথে কোনো চটি বা ধর্ম্মশালা নাই সুতরাং আপনাদের আর উপরে না যাওয়াই উচিত। পূর্ব্বে যাঁহারা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন তাঁহারাই এই সকল তীর্থে যাইয়া মহাপ্রস্থান করিতেন, ফিরিয়া আসিতে পারিতেন না। আপনারা যে তারিখে এখানে আসিয়াছেন ইহা ঠিকই সময়। যাঁহারা এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে নারায়ণ-দর্শন না করিয়াই পাঁচমাইল নিম্নে হনুমান চটি হইতে বরফের জন্য ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। প্রথম যখন যাত্রী আসিতে সুরু করিয়াছিল তখন দুই তিন দিন প্রত্যহ ভীড়ের চাপে শ্রীমন্দিরে প্রায় জনদশ করিয়া যাত্রী মারা গিয়াছে।" বুঝাগেল প্রকৃতপক্ষে বরফ না গলিলে মন্দির খুলিবার কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ নাই। মোটামুটি ১৬ই বৈশাখ শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের মন্দির এবং ২৮শে বৈশাখ শ্রীশ্রী৺বদরী-নারায়ণের দ্বার খুলিবার তারিখ।

আকাশ সদাই মেঘাচ্ছন্ন, বৃষ্টি অনবরত পড়িতেছে। সন্ধ্যার

কিছুপূর্ব্বে শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারতি দেখিবার ইচ্ছায় বাসা হইতে বাহির হইলাম। দর্শনান্তে বড় বড় দোকান দেখিতে দেখিতে ফিরিলাম। এদেশের কিছু চিহ্ন লইয়া যাইব বলিয়া তিন ডজন ফটো, চারিখানা হরিণচর্ম্ম ও একখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম (চিতা) ক্রয় করিলাম। চামেলী হইতে শ্রীনগর পর্য্যন্ত বাসে যাইবার জন্য অগ্রিম স্থান সংরক্ষণের ব্যবস্থা এখানকার বাসসিণ্ডিকেটের অফিসে আছে। চামেলী এখান হইতে আটচল্লিশ মাইল নিম্নে অবস্থিত। সেখানে বাসে স্থান পাওয়া দুরূহ, এই চিন্তা করিয়া বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। গতকল্য হইতে বহুবার অফিসে যাইতেছি কিন্তু কোন ফল হইতেছে না। যাহা হউক বাসায় আসিবামাত্র পাণ্ডাজী জানাইলেন যে আমাদের বাসের ব্যবস্থা তিনি করিয়া রাখিয়াছেন। এখন আগামীকল্য প্রাতে আমরা রওনা হইব এইরূপ স্থির হইল, নতুবা নির্দ্দিষ্ট তারিখে পৌঁছাইতে পারিব না। আজ রাত্রে পায়সান্ন পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। দুধের সের তিনটাকা, পায়সান্ন প্রস্তুতেরই ব্যবস্থা হইল।

নারায়ণের ভোগ পাইতে হইলে একদিন পূর্ব্বে মন্দিরের অফিসে, জনপ্রতি পাঁচটাকা করিয়া জমাদিতে হয়। এইসকল তত্ত্বাবধান আজকাল সরকার নিজে করিয়া থাকেন। যাত্রীদের পক্ষে বেশ সুবিধা হইয়াছে, পাণ্ডাদের জুলুম কোনপ্রকার ভোগ করিতে হয়না। পূজাদির ব্যাপারে ভক্তের "যথাশক্তি দেয়।" আর একটি বিষয়—এই শ্রীমন্দির সংস্কার ব্যবস্থা সম্বন্ধে

জানিতে পারিলাম যে এই বর্ত্তমান মন্দির নূতন, ইহা শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য নির্ম্মান করিয়াছিলেন এবং সম্মুখস্থ নাটমন্দির ও প্রাঙ্গণ প্রভৃতি পূজারীরা পরে নির্ম্মাণ করেন। কাহারও মতে বৌদ্ধযুগে একসময়ে বুদ্ধের শিষ্যেরা মন্দির ধ্বংস করিয়া শ্রীমূর্ত্তি অলকানন্দার মধ্যে নিক্ষেপ করে। অপর মতে চীনদেশীয় আক্রমণাশঙ্কায় তদানীন্তন পাণ্ডারা শ্রীবিগ্রহটি অলকানন্দার মধ্যে লুকাইয়া রাখে কিন্তু পরে আর খুঁজিয়া পায় নাই। বহুবর্ষ পরে শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য এখানে আসিয়া নদীবক্ষ হইতে ঐ শ্রীবিগ্রহ উত্তোলন পূর্ব্বক পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্ত্তিটি শিলাফলকে পদ্মাসনে অবস্থিত চতুর্ভুজ নারায়ণ (বিষ্ণু) মূর্ত্তি। বহুকাল জলমধ্যে থাকায় শিলামূর্ত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত এবং দক্ষিণ ভাগের কয়েকটি অঙ্গুলি ভগ্ন হইয়াছে। পুরীধামে যেমন শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের নানান্ বেশ হয় এখানেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। আসল মূর্ত্তি বুঝিবার উপায় নাই, কারণ মন্দির মধ্যে যে স্থানে বিগ্রহ অবস্থিত, দূর হইতে দীপালোকে তাহা স্পষ্ট দেখা-যায় না। ভিড়ের চাপ এত বেশী যে নিজের ইচ্ছামত দুমিনিট দাঁড়াইয়া যে দেখিব তাহারও কোন উপায় নাই। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিতে হয়। বাজারে যে সকল ছবি বা ফটো বিক্রয় হয় উহা হইতে আসল মূর্ত্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

এই পরম পবিত্র বদরীকাশ্রম ধামের মহিমা অবর্ণনীয়। অপর তীর্থে দশ সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্যা করিলে যে ফল পাওয়া যায় এই নারায়ণের তপোভূমিতে মাত্র একদিন তপস্যা দ্বারা অনুরূপ

ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার পবিত্র মহিমা সম্বন্ধে বহু আখ্যায়িকা আছে। তন্মধ্যে একটি এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

সত্যযুগে এক দানব কৈলাস পর্ব্বতে একলক্ষ বর্ষ কঠোর তপস্যা করতঃ দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া সহস্র কবচ ও কুণ্ডল লাভ করে। কৈলাসাধিপতি ঐ দানবের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন "তুমি যে কবচ লাভ করিলে এগুলি এরূপ দুর্ভেদ্য যে যদি কেহ দশ হাজার বৎসর তপস্যা করে তবে সে তোমার একটি কবচ মাত্র নষ্ট করিতে সক্ষম হইবে।" ভগবান শিবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দানব নিজেকে বিশেষ গর্ব্বিত বোধ করিল এবং কৈলাস ধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তাহার শক্তি কিরূপে কাজে লাগাইতে পারে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে বিশ্বজয়ী হইবার আকাঙ্খায় দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, প্রভৃতি সকলকেই ভয়ে ভীত ত্রস্ত করিয়া তুলিল। এক্ষণে সে সহস্রকবচ দানব নামে পরিচিত, ত্রিভুবনে এমন কোন বীর নাই, যে তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে। সমকক্ষ যোদ্ধা আর না পাইয়া দানব কিরূপে তাহার প্রচণ্ড শক্তির ব্যবহার করিবে তাহাই ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ কৈলাস ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বরদাতা শম্ভুর সহিত শক্তির পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইল। এদিকে ভগবান ত্রিলোচন লক্ষ্য করিলেন যে ঐ অকৃতজ্ঞ দানব তাঁহারই বরে বলশালী হইয়া আজ বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়াছে। তিনি তাহাকে দর্শন না দিয়া তথা হইতে অদৃশ্য হইলেন। দানব ইতস্ততঃ ঘুরিতে

ঘুরিতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিল শম্ভু এক্ষণে কোন কাজে পুরীর বাহিরে গিয়াছেন। অতএব এখন কি করা যায়, উপস্থিত এই মনোরম স্থানের দৃশ্য দেখা যাক। এই ভাবিয়া পদচারণা করিতে করিতে কেদার সন্নিকটে চির হিমগিরি নীলকণ্ঠ পর্ব্বত সমীপে উপস্থিত হইল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া সে অতীব মুগ্ধ হইল এবং চির তুষারাচ্ছন্ন নীলকণ্ঠ পর্ব্বতোপরি পাঁচমাইল দুরারোহ পথ নয়দিনে অতিক্রম করিয়া বদরীবনে আসিয়া পৌঁছাইল। এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক ইতঃস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে একস্থানে এক বিরাট সৌম্য মূর্ত্তিকে ধ্যানমগ্নাবস্থায় দেখিতে পাইল। দানবের, পূর্ব্বে এরূপ প্রসন্ন মূর্ত্তি, বিশালকায় পুরুষ নয়ন গোচর হয় নাই। সে মনে মনে ভাবিল, আজ আমি মনের আনন্দে ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার এই স্কন্ধে সহস্রবাহু ধারণ সার্থক করিব। এই বলিয়া বিকট হাস্থে দশদিক্ মুখরিত করিয়া ঐ ধ্যানমগ্ন পুরুষকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ওরে তপস্বী! আর তোর তপস্যা করিতে হইবে না! আজ আমি তোর মনোবাসনা পূর্ণ করিব। এক্ষণে উঠিয়া আমার সহিত যুদ্ধ কর, যুদ্ধ করিতে যদি নিজেকে দুর্ব্বল বিবেচনা কর তবে আমার বশ্যতা স্বীকার করিয়া মনের আনন্দে নিজস্থানে তপস্যা কর।" সহস্র কবচধারী দানব, শিব বরে বলীয়ান্ হইয়া যখন এইরূপ আস্ফালন করতঃ নিস্তব্ধ পর্ব্বত কন্দর ধ্বনিত করিয়া তুলিল তখন অন্তর্যামী যোগী নারায়ণ সকলই বুঝিলেন।

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী শ্রীহরি, তাঁহাকে যে যেভাবে ভজনা করে,

শত্রু বা মিত্র নির্ব্বিশেষে তিনি কাহারও মনস্কামনা অপূর্ণ রাখেন না। উন্মাদ দানবের প্রার্থনাও বিফল হইল না। এক্ষণে তাঁহার ইচ্ছামাত্রে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষপ্রজাপতির স্ত্রী মনু কন্যা প্রসূতির গর্ভজাতা ত্রয়োদশ কন্যা উৎপত্তি ক্ষেত্ররূপা ধর্ম্মরাজ পত্নী মূর্ত্তি; নর ও নারায়ণ নামক দুই ঋষিকে প্রসব করিলেন। ঋষিদ্বয় নারায়ণ সমীপে আগমন পুর্ব্বক নতজানু হইয়া যুক্তকরে ভগবানের আজ্ঞা প্রার্থনা করায়, নারায়ণ উভয়কে বলিলেন—"দেখ এই সহস্র কবচধারী দানব কবচের প্রভাবে শক্তিশালী হইয়া আত্ম বিস্মৃত হইয়াছে। মূঢ় বদরীকাশ্রম ক্ষেত্রের মহিমা জানে না, আমি তোমাদিগকে ইহা বলিতেছি শুন। এই পবিত্র স্থানে যদি কেহ একদিন মাত্র তপস্যা করে তাহা হইলে অপরক্ষেত্রে দশ হাজার বর্ষকাল তপস্যার ফল এখানে তাহার এক দিনে লব্ধ হয়। তোমরা এখনই তপস্যায় মনোনিবেশ কর এবং কল্য প্রাতে তোমাদের মধ্যে নারায়ণ, প্রথমে সহস্র কবচ দানবকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া এক কবচ কুণ্ডল ছেদন করিবে। এইরূপে প্রত্যহ তোমাদের মধ্যে একজন করিয়া উহার সহিত যুদ্ধ করিতে থাক।" এই কথায় নারায়ণ ঋষি দানব সমীপস্থ হইয়া তাহাকে পরদিবস প্রাতে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। দানব বলিল "তুমি বালক, তোমার সহিত কি যুদ্ধ করিব! তুমি বরং ঐ বিশালকায় সৌম্যমূর্ত্তি তপস্বীকে উঠাও, আমি উহার সহিত যুদ্ধ করিয়া আমার রণপিপাসা মিটাই।" ইহাতে ঋষি নারায়ণ কহিলেন "তুমি অগ্রে আমাদিগের সহিত

যুদ্ধ কর, আমরা পরাজিত হইলে পরে ঐ তপস্বীর সহিত যুদ্ধ করিবে।" পরদিন প্রাতে ঋষি নারায়ণ যুদ্ধার্থে আসিয়া উপস্থিত এবং দানবও সোল্লাসে পদাঘাতে পৃথিবী বিকম্পিত করিয়া বালক নারায়ণ ঋষির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। নারায়ণ ঋষি তাঁহার ধনুতে শর যোজনা করিয়া এক কবচ ও কুণ্ডল খণ্ডন করিলেন। সামান্য বালকের সহিত যুদ্ধে কবচ কুণ্ডল নষ্ট হওয়ায় উন্মত্ত দানব কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইল। কেবল ভাবিতে লাগিল ভগবান শিব বলিয়াছিলেন, বিনা দশ হাজার বর্ষ তপস্যায় কেহ আমার এই অভেদ্য কবচ কুণ্ডল ছিন্ন করিতে পারিবে না। কিন্তু এই তুচ্ছ বালক দশ হাজার বর্ষ তপস্যা করিবার সময় কোথায় পাইল? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে নর-ঋষি আসিয়া তাহার আর এক কবচ কুণ্ডল কাটিয়া ফেলিলেন। ইহাতে দাম্ভিক অসুরের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই প্রকারে প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে ঋষি নর ও নারায়ণ তাহার নয়শত নিরানব্বই কবচ কুণ্ডল ছেদন করিলেন। দানব আজ বিষণ্ণ ও চিন্তাকুল, কেবল ভাবিতেছে হায়! আমার লক্ষ বর্ষ তপস্যালব্ধ সহস্র কবচ কুণ্ডল এক্ষণে এই বালকদ্বয়ের হস্তে একটিতে পরিণত হইয়াছে এবং রাত্রি প্রভাত হইলে ইহাও নিশ্চিহ্ন হইবে। এক্ষণে কি করা যায়! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিশা অবসান হইল। পূর্ব্ব গগন প্রভাতরাগে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, জগৎ আলোকে আলোকময়! সহস্র কবচ দানব রণে ভঙ্গ দিয়া

ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া তরুণ অরুণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শেষ কবচ ও কুণ্ডলটি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিল। নর ঋষি আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রণে ভঙ্গ দিয়া সূর্য্যদেবের শরণ লইয়াছে। সহস্র কবচ দানবের আপাততঃ এইখানেই যুদ্ধের অবসান ঘটিল বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অমীমাংসিত যুদ্ধ তাহার প্রারব্ধ হইয়া রহিল।

"পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্,
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

এই গীতা বাক্যের সত্য রক্ষার্থে দ্বাপর যুগে ঋষি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে জগতে আবির্ভূত হইয়া নানাভাবে ভূভার হরণ করেন। ঋষি নর তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনরূপে অবতীর্ণ হন এবং অর্জ্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সহস্রকবচ দানব সূর্য্যপ্রদত্ত কবচকুণ্ডল-ধারী কর্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, বাল্যে মথুরাধিপতি কংসপ্রেরিত বহু অসুরকে শমন সদনে প্রেরণ করেন কিন্তু অসুর বধকালে ভগবান কখনও কোন প্রকার বিরাটমূর্ত্তি বা অস্ত্রের সাহায্য লন নাই। এই বাল্যলীলা তাঁহার মাধুর্য্যলীলা। যৌবনেও তিনি কোন অস্ত্রধারণ না করিয়া নরোত্তম অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণপূর্ব্বক দুরন্ত ক্ষাত্র শক্তিকে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে ধূলিসাৎ করেন। কর্ণের নিকট অভেদ্য কবচ ও কুণ্ডল থাকায় নরলোকে তিনি অজেয়। কারণ দশসহস্র বর্ষ তপস্যা করিলে তবে ঐ কবচ ও কুণ্ডল বিদারণ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। অন্তর্যামী কৃষ্ণ কিন্তু এই ব্যাপার জানিতেন বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই দেবরাজ ইন্দ্রকে

ব্রাহ্মণবেশে পাঠাইয়া ঐ কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা লইয়া আসেন। কর্ণ কৌরবপক্ষে সেনাপতি হইয়া শেষে ফাল্গুনীর হস্তে নিহত হন। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণের চক্রী লীলাই প্রকট হইয়াছে।

"পঞ্চবদরী"—যথা বিশালবদরী, যোগবদরী, ভবিষ্যবদরী, ধ্যানবদরী ও আদবদরী। যাত্রীদের বদরীকাশ্রমে আসিবার সময় উল্লিখিত পঞ্চবদরীর প্রত্যেকটি রুদ্রপ্রয়াগ হইতে চামেলীর পথ ধরিয়া বদরীকাশ্রমের মধ্যেই অবস্থিত। বদরীকাশ্রমের শ্রীমূর্ত্তিই "বিশালবদরী", এখান হইতে এগার মাইল নিম্নে পাণ্ডুকেশ্বর গ্রামে "যোগবদরী," পাণ্ডুকেশ্বর হইতে আট মাইল নিম্নে যোশীমঠ এবং তথা হইতে বার মাইল দূরে কৈলাস মানস-সরোবরের পথে "ভবিষ্যবদরী," যোশীমঠ হইতে ছয় মাইল নিম্নে হেলাংএর কুমার চটি হইতে অর্দ্ধমাইল নিম্নে "ধ্যানবদরী" ও হেলাং হইতে পঞ্চাশ মাইল নিম্নে কর্ণপ্রয়াগ এবং ঐ প্রয়াগ হইতে বার মাইল দূরে "আদবদরী" দ্রষ্টব্য।

আজ দুইরাত্র আমরা পুরী বদরীকা ধামে বাস করিলাম, কোন অসুবিধা বা অভাব বোধ হয় নাই। এখানে দাতব্য চিকিৎসালয়, ঔষধালয়, অন্নসত্র, সদাব্রত, থানা, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ অফিস ও নলের জল (Pipe water) প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শীতের প্রকোপ অত্যন্ত কিন্তু স্নান করিতে কোন অসুবিধা নাই, নিকটেই উষ্ণকুণ্ড। প্রায় ষাটজন স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহারোপযোগী পাকা খাটা পায়খানা আছে এবং ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই মেথর

পাণ্ডুকেশ্বর গ্রামের দৃশ্য—পৃঃ ৭৩

পরিষ্কার করিতেছে। এস্থলে সরকারী ব্যবস্থা অতীব প্রশংসনীয়। ইহা না থাকিলে যাত্রীগণ বিশেষ অসুবিধায় পড়িত।

২০শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ছয়টার পর পাণ্ডাঠাকুর আমাদিগকে সুফল করাইলেন। তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ শ্রবণ করিয়া মনে এক পবিত্র ভাবের আবেশ জাগিল। ইচ্ছা হইল কিছুদিন এইস্থানে বসবাস করি। সুফল করার প্রথা শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে হিন্দুদিগের ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য, শাস্ত্রানুযায়ী এই চারি আশ্রম ছিল। যাঁহারা বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থ অর্থাৎ তৃতীয়াশ্রম গ্রহণ করিতেন তাঁহারা নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে এই বদরীকাতে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই দারুন শৈত্যে তুষার প্রান্তরে চিরশান্তি লাভ করিতেন। যাঁহারা এই তপোভূমিতে আসিয়া নারায়ণ দর্শনে সক্ষম হইতেন তাঁহারাও ধর্ম্মানুশাসনানুযায়ী দেশে ফিরিতে পারিতেন না। পাণ্ডবদিগের ন্যায় স্বর্গারোহণের পথে আগাইয়া যাইতেন আর পুনরাবতরণে সক্ষম হইতেন না। দ্বিতীয়াশ্রমী কোন গৃহী এ তীর্থে আসিতে সাহস পাইত না। কালের প্রভাবে চতুরাশ্রম এক্ষণে এক গার্হস্থ্যে পরিণত হইয়াছে। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য জীবের মঙ্গলের জন্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম করাইলেন। তিনি নিয়ম করিয়া গিয়াছেন যে, কোন গৃহী যদি এই পূণ্যভূমিতে আসে সে তীর্থ কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তাহার তীর্থ পাণ্ডার নিকট সুফল করাইয়া ক্ষমতানুরূপ দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক পাণ্ডার অনুমতি ক্রমে দেশে ফিরিতে পারিবে। সেই শঙ্কর যুগ

হইতে আজিও এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। আমরাও আজ সুফলান্তে পাণ্ডাঠাকুরের ঐকান্তিক আশীর্ব্বচন লাভ করিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে প্রাতঃ সাতটা পনের মিনিটে "জয় বদরী-নারায়ণকি জয়" বলিয়া স্বদেশের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। হরিদ্বার হইতে সওয়া দুইলক্ষ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া উত্তরাখণ্ডের এই পবিত্রক্ষেত্রে বহু পুণ্যফলে আসিতে সক্ষম হইয়াছি। পথে চুরাশি লক্ষ তীর্থ বিদ্যমান। যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম বহু বর্ষ ধরিয়া মনের গভীরতম স্থলে মাত্র বাসনায় লুক্কায়িত ছিল আজ তাহা সাফল্যে পর্য্যবসিত হইল।

পুনরাবতরণ

যে পথে আসিয়াছিলাম সেই পথই অনুসরণ করিলাম। এক্ষণে আমরা উতরাই পথে চলিয়াছি, কোন পথশ্রম নাই। পথিপার্শ্বে এক বৃদ্ধাকে মাটিতে বসিয়া ক্রন্দন করিতে দেখিলাম। কারণ জিজ্ঞাসায় জানিলাম, পড়িয়া যাওয়ায় পায়ে যন্ত্রণা হইতেছে, আমার নিকট "ওরিয়েন্টাল বাম" ছিল বাহির করিয়া তাঁহার পায়ে মালিশের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের গন্তব্য-পথে আগাইয়া চলিলাম। পথিমধ্যে প্রায়ই শ্রান্ত পথিকেরা আমাদিগকে দেব দর্শনান্তে ফিরিতে দেখিয়া "জয় বদরীনারায়ণ কি জয়" বলিয়া অভিবাদন জানায় এবং আমরাও প্রত্যভিবাদনে পথ আর বেশী দূর নহে, এই আশ্বাস বাক্য শুনাইয়া চলিতে

থাকি। পাঁচমাইল অতিক্রম করিয়া হনুমান চটিতে মিনিট পনের বিশ্রাম করিলাম। পুনরায় চারি মাইল বেড়াইতে বেড়াইতে এগারটা কুড়িমিনিটে "লামবগড়ে" আসিয়া ধর্ম্মশালায় উঠিলাম কিন্তু ইহা নূতন নির্ম্মিত হওয়ায় নানা অবন্দোবস্ত, উহা ত্যাগ করিয়া সম্মুখস্থ এক চটিতে আশ্রয় লইলাম। ঝুপ ঝাপ বৃষ্টি পড়িতেছে স্নানাহার শেষ করিয়া লম্বা বিছানা পাতিয়া সকলে শুইয়া পড়িলাম। প্রত্যক্ষদর্শীর একটি বিষয় উল্লেখ না করিলে মনে হয় লেখনীর যথাযথ মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। ব্যাপারটি সামান্য, উপেক্ষণীয়ও নহে। এই গাড়োয়াল প্রদেশের মানুষেরা যেমন ভদ্র তেমনি সরলান্তঃকরণ এবং ইহা খুবই হৃদয়স্পর্শী কিন্তু ইহার মক্ষিকাকুল সম্পূর্ণ বিপরীত, ইহাদের ভদ্রতা ও সরলতা আদৌ নাই বলিলেই চলে। মাত্র দুইটি স্থানে ইহাদের আধিপত্য নাই, পুরী কেদারে ও পুরী বদরীকাশ্রমে। রন্ধনান্তে আহার্য্য গ্রহণকালীন ইহাদের আচরণ বিশেষ অস্বাচ্ছন্দদায়ক। বামহস্তে ব্যজন না করিলে দক্ষিণ হস্তের ভোজনসুখ নিষ্ফল হয়। এত গেল সাধারণ মাছি, কিন্তু আর এক প্রকার মাছি আছে যাহা ইহা অপেক্ষা বহুগুণ বৃহৎ। ভ্রমণকালে হাতের ও পায়ের যে অংশ অনাবৃত থাকে ঐ অংশে ইহাদের আধিপত্য। এমন হুল ফুটাইয়া দেয় যে সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ কিছু বুঝা যায়না বটে কিন্তু পরে আক্রান্ত অংশ ফুলিয়া উঠে ও ক্ষতে পরিণত হয়। আমার নিকট "মারকিউরোক্রোম" নামে ঔষধ ছিল, উহার ব্যবহারে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই।

বৈকাল সাড়ে তিনটায় আবার রওনা হইলাম। আড়াই মাইল পথ হাঁটিবার পর চারিটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পাণ্ডুকেশ্বর গ্রামে আসিলাম।· উঠিবার সময় ধর্ম্মশালায় আশ্রয় পাইয়াছিলাম কিন্তু আজ নিকটস্থ এক চটিতে স্থান গ্রহণ করিতে হইল। এখন দ্রষ্টব্য বিষয়ে অনুরাগ বিশেষ নাই কারণ পূর্ব্বেই দর্শন হইয়াছে, আজ কেবল ফিরে চলার সুর প্রাণে বাজিতেছে। আগামীকল্য প্রাতে আমরা যোশীমঠে যাইয়া মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিব। ছয়মাইল দূরে বিষ্ণুপ্রয়াগ, পথ উতরাই কিন্তু বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে যে দুই মাইল পথ যোশীমঠে গিয়াছে আসিবার কালে যাহা অত্যন্ত উতরাই ছিল এক্ষণে তাহা চড়াই-এ পরিণত হইবে। কানন ভাইকে আমার জন্য একটি ঘোড়ার ব্যবস্থা করিতে বলিলাম। সে, রাত্রে দুইবার ঘোড়ার আড্ডায় যাইয়া ঘোড়ার ব্যবস্থা করিয়া রাখিল। ঘোড়া অপেক্ষা সস্তায় কাণ্ডী পাওয়া যায়। বাঁশের সরু সরু বাঁখারি দ্বারা নির্ম্মিত বসিবার বৃহৎ বেতের মোড়ার ন্যায় দেখিতে। মোড়াটি উল্টাইয়া পিঠে বাঁধিয়া উহারই মধ্যে একজন মাত্র যাত্রী বসাইয়া কাণ্ডীওয়ালা স্বচ্ছন্দে চলিতে থাকে। ভাড়া প্রতি মাইল ছয় হইতে আট আনা মাত্র। আমি কিন্তু ঘোড়াই পচ্ছন্দ করি। কানন নিজে খুব হন্ হন্ করিয়া হাঁটিতে পারে এবং মহারাজ সন্ন্যাসী, ত্যাগী ও বিশেষ কষ্টসহিষ্ণু, ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহারাজের অনুগামী আর নন্তে ও শ্যাম এরা ছেলেমানুষ। আমি ভিন্ন সকলেই পদব্রজের পক্ষপাতি। সমতল বা উতরাই

পথে আমার কোন অসুবিধা নাই, দিনে বিশমাইল পর্য্যন্ত পা চলে, যে কয় স্থলে বিশেষ বিশেষ চড়াই সেখানেই ঘোড়ার সাহায্য লইতেছি, কেননা বিহারের পরেশনাথ পাহাড়ের কষ্ট এখনও ভুলি নাই। একটি ব্যাপার বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি যে, কে আগে যাইতে পারে এইরূপ প্রতিযোগীতা সুলভ মনোভাব সঙ্গীদিগের মধ্যে অনিচ্ছাসত্বেও প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা স্পষ্ট বলেন যে আস্তে আস্তে চলিলে অসুবিধা হয়, অবশ্য ইহাতে একদিকে আমার পক্ষে উহাদের সহিত তাল রাখিয়া চলা যেমন দৈহিক পীড়াদায়ক হইয়াছিল অপর পক্ষে তেমন ইহা আমাদের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল। যাহাকে বলে "শাপে বর।" যখনই পথ হাঁটিতে হাঁটিতে পিছনে পড়িয়াছি তখনই মহারাজকে তাঁহার সহানুভূতিসূচক ব্যবহারে আমার পার্শ্বে দাঁড়াইতে দেখিয়াছি, আবার যখন একাকী বিশ্রাম করিতে বসিয়াছি তখনই তাঁহাকে আমার সহিত বিশ্রাম করিতে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখিয়াছি। তিনি কাহাকেও পশ্চাতে রাখিয়া যাইতে চাহেন না।

২১শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে পাণ্ডুকেশ্বর ত্যাগ করিলাম। সেই পুরাতন পথ, বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকটবর্ত্তী এক খাবারের দোকানে প্রাতরাশ সম্পন্ন করা গেল। কানন ভাই আজ নিজের খরচায় আমাদের সকলকে জিলিপি খাওয়াইল, বুঝিলাম তীর্থভ্রমণ করিয়া ভাই এর মনে আনন্দ হইয়াছে। এই স্থান হইতে বিষ্ণুপ্রয়াগ প্রায় দেড় ফারলং, পথ উতরাই।

অলকানন্দার সেতু পার হইয়াই চড়াই পথ সুরু হইল। সেতু পার হইবার সময় পুলিশ যাত্রীর ভীড় নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সেতুটি জখম হওয়ায় অধিক ভার লইতে অক্ষম। সেইজন্য এক সঙ্গে দুইজন উঠিতে দিতেছে না। একটি একটি করিয়া পার করাইতেছে। আজ আমাদের শেষ চড়াই ভাঙ্গা। পাণ্ডুকেশ্বর হইতে আটমাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা দশটায় "যোশীমঠে" আসিলাম। ধর্ম্মশালায় আহার ও বিশ্রাম করিয়া বৈকাল তিনটা পনের মিনিটে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে যোশীমঠ হইতে অবতরণ করিয়া ক্রমান্বয়ে উতরাই পথে চলিয়াছি, পথকষ্ট নাই। চতুর্দ্দিকের পাহাড়ী গাছপালা, গিরিগুহা, সুউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে সানন্দে ছয়মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে "কুমার চটিতে" আসিলাম। নন্তে ও শ্যাম অগ্রিম আসিয়া ধর্ম্মশালাতে একখানি ঘর সংগ্রহ করিয়াছে। আজ এখানেই রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হইল।

২২শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে পাঁচটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে কুমার চটি হইতে বাহির হইয়া পৌনে পাঁচমাইল উতরাই পথে "পাতাল গঙ্গায়" আসিলাম। এখানে জলযোগ গ্রহণ ও মিনিট পনের বিশ্রাম করিলাম। তৎপরে দেড়মাইল ধ্বসভাঙ্গা সঙ্কীর্ণ ক্রমোচ্চ পথ অতিক্রম করিয়া এবং দেড়মাইল সমতল পথ পার হইয়া বেলা দশটা ত্রিশ মিনিটে "গরুড়গঙ্গায়" আসিয়া এক চটিতে উঠিলাম। এ পথে কাপড়-চোপড় ভীষণ ময়লা হয়। বলবীরের দ্বারা প্রায় একদিন অন্তর সাবান দিয়া কাচাইয়া লই; আজ কিছু

বেশী কাচিতে দিলাম কারণ চামেলীতে উহাদিগকে বিদায় দিতে হইবে। কুলি দুইটিকে বরাবর যখন যে কাজ দেওয়া হয় হাসিমুখে করে এবং ইহাদের ব্যবহার অতি ভদ্র। আমাদের সহিত এমন আপন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে অনেক সময়ে মাহিনা করা ঠিকা কুলি বলিয়া মনে হইত না। সকলে স্নান করিতে গেল, আমি বারাণ্ডায় বসিয়া দুইখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়া স্নানাহারে মন দিলাম। বিশ্রামান্তে বেলা চারিটার সময় পুনঃ রওয়ানা হইলাম। পথ আমাদের এখন চেনা—কারণ একই পথ পর্ব্বত গাত্র বহিয়া বক্রগতিতে চলিয়াছে এবং নিম্নে গঙ্গা ও পার্ব্বত্য ঝরণাগুলি পথের সহিত সমান্তরে প্রবাহিত হইয়া দিকে দিকে ছুটিয়াছে। বদরীকাশ্রম গমনকালে এই সকল পথ হাঁটিতে যে পরিমান সময় লাগিয়াছিল অবতরণকালে তদপেক্ষা অল্প সময় লাগিল। চারিমাইল পথ অতিক্রম করিবার পর দিবালোক ক্ষীণ হইয়া আসিল। এখনও সন্ধ্যার অন্ধকার নামে নাই বটে, নিকটে "পিপলকুঠি" ধর্ম্মশালায় স্থানান্বেষণ করা হইল কিন্তু অত্যধিক যাত্রীর ভিড় দেখিয়া নিকটস্থ একটি চটিতেই উঠিলাম। নিকটে নলের জলে মুখ হাত ধুইয়া চা পান করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। কেহ কেহ দোকান দেখিতে গেলেন এবং কেহ বা নৈশ ভোজনের আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। শ্যাম এখানে একটি বৃহৎ চামর ক্রয় করিল। সকলে মিলিয়া যখন চা পান করিতেছি এমন সময় জন কয়েক লোক (গাড়োয়ালী) আসিয়া এক দোভাষী মাধ্যমে বাঙ্গালায় তাঁহাদের

বক্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, স্থানীয় বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহারা চাঁদা সংগ্রহ করিতে আসিয়াছেন। একটি টাকা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলাম। এদেশের প্রার্থী বা ভিখারীদের কোন জুলুম নাই।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে পাঁচটা পনের মিনিটে যথা নিয়মে পিপলকুঠি হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। পথের কোন অসুবিধা নাই। পথ নিম্নাভিমুখী (উতরাই), আজ আমাদের ইচ্ছা মধ্যপথে কোথাও অপেক্ষা না করিয়া একেবারে চামেলীতে পৌঁছান। দূরত্ব নয়মাইল। বেলা দশটায় "চামেলী বা লালসাঙ্গায়" আসিলাম। ধর্ম্মশালাগুলি লোকে লোকারণ্য, চটি-গুলিতে কিন্তু ভিড় তদ্রূপ নহে। এখান হইতে শ্রীনগরাভিমুখী বাস অত্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক এবং যাত্রীর সংখ্যা অত্যধিক, যাত্রীদিগকে বাসের প্রত্যাশায় প্রায় চারি হইতে ছয় দিবস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইতেছে। এস্থলে চটিওয়ালারা যাত্রীদিগের নিকট হইতে জন প্রতি দৈনিক চারি পাঁচ টাকা করিয়া ভাড়া লইতেছে। গরম তীব্র, জিনিষ পত্র বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, পানীয় জলের নিতান্ত অভাব। আমরা পূর্ব্বে যে ধর্ম্মশালায় উঠিয়াছিলাম উহারই দোতলার বারাণ্ডায় একপার্শ্বে কম্বল বিছাইয়া স্থান দখল করা গেল। ব্যাপার দেখিয়া আজ স্নান ও রন্ধনের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

এখান হইতে কিরূপে বাহির হইব ইহাই ভাবনার বিষয় হইল। বদরীকাশ্রমে আমরা বাসে অগ্রিম স্থান সংরক্ষণ করিয়া

বদরীকাশ্রম সন্নিধানে তুষার ক্ষেত্র—পৃঃ ৭৭

রাখিয়াছিলাম, উহাতে যে তারিখে বাসের টিকিট পাইবার কথা আমরা উহার দুইদিন পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কানন, নন্তে ও শ্যাম বাসের ব্যবস্থায় চলিয়া গেল। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে সকলে নিরুপায় হইয়া ফিরিয়া আসিল। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ প্রায়, দোকানের পুরী, লাড্ডু প্রভৃতি দ্বারা মধ্যাহ্ন ভোজন সম্পন্ন করা গেল। পুনঃ বাসের টিকিট সংগ্রহের চেষ্টা চলিল। এবারে সঙ্গে বলবীরকেও পাঠান হইল উদ্দেশ্য, যদি টিকিট পাওয়া যায় সে অগ্রিম আসিয়া সংবাদ দিবে আর আমরা সব বাঁধাবাঁধি করিব। প্রায় আড়াইটার সময় বলবীর ও কানন ব্যস্ততার সহিত ছুটিয়া আসিল এবং টিকিট পাওয়া যাইবে জানাইল। বাঁধ বাঁধ, সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে আহারাদির পর কুলি বিদায় পর্ব্ব শেষ করিয়াছি যাহার যা প্রাপ্য ছিল সমস্ত মিটাইয়া একখানা করিয়া রসিদ পত্রে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের টিপ লাগাইয়া লইলাম। জয়রাম তাহার অসুস্থতার সময় দেখাশুনার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

প্রায় আড়াইটার সময় ধর্ম্মশালা হইতে বাহিরে আসিয়া দক্ষিণ দিকে অলকানন্দার সেতু হইতে যে পথ সোজা বামে গিয়াছে ঐ পথ ধরিয়া বাস ষ্ট্যাণ্ডে আসিলাম। আজ যেমনই রৌদ্র তেমনই গরম, পিপাসায় ছাতি ফাটিতেছে, একটি পানীয় জলের নল নিকটেই ছিল কিন্তু জল এত উষ্ণ যে উহা সম্পূর্ণ অপেয়। নন্তে ও শ্যাম টিকিট লইয়া আসিল। সকলে একখানি নির্দ্দিষ্ট বাসের ছাদে বলবীরের সাহায্যে মালপত্র উঠাইয়া

দিয়া ভিতরে বসিলাম। সকলেই তৃষ্ণার্ত্ত, নন্তে বলিল "একজায়গায় জল দিতেছে ঘটি দিন।" জল আনিলে সকলেই তৃপ্তি পূর্ব্বক শীতল জল পান করিলাম। সওয়া তিনটায় বাস ছাড়িল। বাসের টিকিট ক্রয়ের পূর্ব্বে যাত্রীশুল্ক (Toll), গঙ্গার পরপারে সেতু পার্শ্বে টোল অফিসে জমা দিয়া রসিদ আনিতে হয়। ঐ রসিদ সহ বাস ভাড়ার টাকা বাস ষ্ট্যাণ্ডে বুকিং অফিসে জমা দিলে টিকিট পাওয়া যায়। চামেলী হইতে শ্রীনগরের ভাড়া চারি টাকা চৌদ্দ আনা মাত্র। ভিড় অত্যন্ত কিন্তু বাসের মধ্যে অসুবিধা নাই কারণ যতজন বসিতে পারে ততজনের টিকিট দেওয়া হয়, দাঁড়াইয়া যাইতে দেওয়া হয় না। প্রায় মাইল দুই পথ আসিয়া দেখি আমাদের কুলি জয়রাম তার ছোট পুঁটুলিটি পিঠের উপর লইয়া একাকী চলিয়াছে। সে বলিয়াছিল বাড়ী যাইবে আর মোট বহিবে না, কথাটা সত্য। প্রায় সাতমাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাস "নন্দপ্রয়াগে" আসিয়া থামিল। ইহা অলকানন্দা ও গঙ্গানন্দার মিলন স্থল, অতি সুন্দর স্থান। হঠাৎ ঝড় উঠিল, ধূলাবালিতে আকাশ বাতাস ভরিয়া গেল, পর্ব্বতশিখর হইতে প্রস্তরখণ্ড বিক্ষিপ্ত হইয়া ইতঃস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। কয়েক খণ্ড আমাদের বাসের ছাদের উপর পড়িল। বৃষ্টি হইতে পারে আশঙ্কায় বাস চালকেরা ছাদের উপরের মালপত্রগুলি ত্রিপল দ্বারা ঢাকিয়া দিল। এস্থানে রাজা নন্দ, রমাপতি, মহাদেব ও গোপালের মন্দির আছে। বাস থামিবামাত্র যাত্রীদের অধিকাংশই বাস হইতে নামিয়া সঙ্গমাভিমুখে চলিল। আমাদের

বাসের সম্মুখে দুইখানি ও পশ্চাতে পাঁচখানি বাস ছিল। ফেরি-ওয়ালারা কাঁকড়ি ও অন্যান্য জিনিষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেচিতেছে। এখানে বড় বড় দোকান, বাজার, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, নলের ও ঝরণার জল এবং ডাকবাঙ্গলা আছে। আমরা সঙ্গমের জল স্পর্শ করিলাম। শীতল নির্ম্মল জলস্পর্শে অন্তরে পবিত্রতার উদ্রেক হইল। মনে হইল একটা স্বর্গীয় ভাব দেহমনকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, কি শান্তি! বাস অর্দ্ধঘণ্টা থামিবার পর পুনঃ ছাড়িল। আকাশ পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার হইয়াছে। তেরমাইল পথ ক্রমান্বয়ে চলার পর কর্ণ প্রয়াগে আসিয়া থামিল। এই স্থান পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবীর কানীনপুত্র মহারথি কর্ণের তপোভূমি এবং পিণ্ডর গঙ্গা ও অলকানন্দার মিলন স্থল। রাজা কর্ণ এই স্থানে সূর্য্যের তপস্যা করিয়া অভেদ্য কবচ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে মতভেদ আছে, কেহ কেহ বলেন উহা সহজাত কবচকুণ্ডল, ইহজন্মে তপস্যালব্ধ নহে। পাণ্ডারা কিন্তু পূর্ব্বানুরূপই বলেন। মহারাজ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় সঙ্গম হইতে ঘুরিয়া আসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি টিনে করিয়া সঙ্গমের পবিত্র জল আনিয়াছিলেন আমাদের মাথায় ছিটাইয়া দিলেন। এই স্থান হইতে একটি হাঁটাপথ রাণীক্ষেত ও কাঠগুদামে, একটি দেবপ্রয়াগে এবং আর একটি গিয়াছে কোটদ্বারে। বাস রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া শ্রীনগর পর্য্যন্ত গিয়াছে। এখানে ধর্ম্মশালা, চটি, হাঁসপাতাল, দোকান, সদাব্রত, থানা, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। পানীয় জল নলের। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা থামিয়া বাস পুনরায়

চলিল। ছয়মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গোচর গ্রাম, এখানে একটি বৃহৎ বিমান অবতরণ ক্ষেত্র রহিয়াছে। গত ১৯৩৬ সালে হরিদ্বার হইতে এইস্থান পর্য্যন্ত নিয়মিত ভাবে বিমান চলাচল করিত, কিন্তু বর্ত্তমানে চলেনা।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সাড়ে আঠারমাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাস "রুদ্রপ্রয়াগে" আসিয়া থামিল। দূর হইতে অলকানন্দার সেতু দেখিয়া চিনিলাম, ইহার পরিচয় দিবার আর প্রয়োজন হইল না। কেদার গমন কালে এইস্থান হইতেই মন্দাকিনীর তটস্থ হাঁটাপথে কত কি ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞানাপথে অগ্রসর হইয়াছিলাম। বাসষ্ট্যাণ্ডের পার্শ্বেই খানকতক ছোট ছোট দোকান, একটিতে জলযোগ সারিয়া লইলাম। অর্দ্ধঘণ্টাকাল অপেক্ষা করার পর বাসগুলি হেড-লাইট জ্বালিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে পাহাড়ী পথের ধূলা উড়াইয়া হর্ণ বাজাইতে বাজাইতে আঁকা বাঁকা পাহাড়িয়া পথে ছুটিতে লাগিল।

ঘন অন্ধকারে পর্ব্বতগাত্রস্থ সঙ্কীর্ণ পথে ঘন ঘন মোড় ঘুরিতে ঘুরিতে এ দেশীয় বাস চালক তাহার যে অভিজ্ঞতার পরিচয় দেয় তাহার সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। এইভাবে বাইশমাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাত্রি সাড়ে নয়টায় "শ্রীনগরের" বাস ষ্ট্যাণ্ডে আসিয়া পৌঁছাইলাম। বলবীর এখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়ে নাই। মালপত্র আপনা হইতেই গাড়ীর চাল হইতে নামাইয়া লইল। অন্ধকারে দিক্‌ভ্রম হইতেছে, পিঠের হ্যাভারস্যাক হইতে

টর্চ বাহির করিলাম। প্রথমেই সোজা কালীকম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালার দিকে আসিলাম। ইহা এক বিরাট ধর্ম্মশালা প্রায় দেড়হাজার যাত্রীর বাসোপযোগী। আজ যাত্রীসমাগম বেশী হইয়াছে একটি ঘরও খালি নাই এমন কি বারাণ্ডা ও উঠান পর্য্যন্ত ভরিয়া গিয়াছে। আমরা কোন রকমে দ্বিতলে রাস্তার দিকের বারাণ্ডায় বিছানা পাতিয়া লইলাম। এখানে এখন বেজায় গরম পড়িয়াছে। হাত পা মুখ ধুইয়া শুইয়া পড়িলাম। আজ সাড়ে ষাট মাইল একটানা বাসে আসায় পরিশ্রম না করিয়াও পরিশ্রান্ত। দশটা বাজিয়া গিয়াছে দোকান বাজার বন্ধ হইতেছে সঙ্গীরা আহারের ব্যবস্থার প্রস্তাব তুলিলেন, কিনিয়া খাওয়াই স্থির হইল। আমার আহারে রুচি নাই জানাইলাম কিন্তু কানন ভাই এবং নন্তে বাহির হইতে ভোজন সমাপ্ত করিয়া, পর পর দুইজনেই আমার জন্য এক এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ লইয়া আসিল। অবশ্য আমি দুইজনেরই মান রক্ষা করিয়া আজিকার মত বিছানায় আশ্রয় লইলাম। রাত্রি এগারটা, ঘোর অন্ধকার, প্রায় চল্লিশ জন যাত্রী এই বারাণ্ডায় শুইয়া আছে। সকলে নিদ্রামগ্ন, আমাদের চোখে ঘুম নাই। বাসস্ট্যাণ্ড হইতে আসিবার কালে টিকিটঘর বন্ধ বলিয়া বাসের কোন ব্যবস্থা করিতে না পারায়, আগামীকল্য এখান হইতে রওনা হইতে পারিব কিনা এই কথাই ভাবিতেছি, এমন সময় রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দশ বার হাত দূরে তীব্র নারীকণ্ঠের শব্দ শুনা গেল। একজনের গামছা চুরি গিয়াছে সেই গামছা পুনঃ

প্রাপ্তির আশায় কটুভাষা ও তিরস্কারের পালা চলিতেছে। চীৎকারে মন কিছু বিচলিত হইল। বাক্‌বিতণ্ডার মাঝখানে বুঝিতে পারিলাম মহিলাদ্বয় সম্প্রতি কেদারবদরী দর্শন করিয়া আজ কয়দিন হইল বাসের টিকিট না পাইয়া এইস্থানেই অবস্থান করিতেছেন। আমার এই ঘটনায় কোন আগ্রহ নাই, ইহা পরচর্চ্চা মনে করি তথাপি বিবাদে এমন একটি কথা কানে আসিল যাহা এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাঁহাকে গামছা নিখোঁজের দায়ে দায়ী করা হইয়াছে তিনি সমান ভাবে কটুবাক্যে প্রত্যুত্তর করিয়া শেষে বার বার বলিতে লাগিলেন "আমি বাবা বদরীনাথের পায়ে হাত দিয়া বলিতে পারি তোমার গামছা লই নাই।" এই শেষোক্ত শপথ বাক্যই বিশেষ করিয়া আমার শ্রুতি আকর্ষণ করিল। কেদারবদরী এখান হইতে যাতায়াত দুইশত পঁচাশিমাইল এবং কেদার বাদ দিলে বদরীনাথ দুইশত চৌদ্দমাইল এবং ১০৫০০ ফুট উচ্চে। একবার ঘুরিয়া আসিয়া তখনই প্রতিজ্ঞামত পুনঃ চরণস্পর্শ করিতে যাইবার ধৈর্য্য কিরূপে আসে! দ্বিতীয়তঃ বদরীনারায়ণের চরণ যাত্রীদিগকে স্পর্শ করিতে দেওয়া হয়না। এই সকল তথ্য বোধ হয় এঁরা ভাবেন না তাই কথায় কথায় শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন।

হরিদ্বার যাইতে হইলে এখান হইতে তিন মাইল হাঁটাপথে অলকানন্দা পার হইয়া কীর্ত্তিনগরে যাইয়া বাস ধরিতে হয়। কিন্তু আমি যে পথে আসিয়াছি ঐ পথে আর যাইতে চাহিনা।

নূতন পথে যাইতে ইচ্ছা হয়, বাসে এখান হইতে কোটদ্বার যাওয়ার ঠিক হইল।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ—নন্তে শ্যাম ও কানন বাসের আড্ডায় প্রাতঃ পাঁচটায় টিকিটের চেষ্টায় বাহির হইয়া গেল। বলবীর আজ বিদায় লইতে চাহে কারণ সে হরিদ্বার হইয়া দেরাদুন যাইবে। আমি বলিলাম 'আমাদিগকে বাসে তুলিয়া দিয়া তুমি যাইবে', ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে জানাইল। নিকটস্থ যাত্রীদিগের মধ্য হইতে এক এক জনের নিকট এক এক রকম খবর শুনিতে পাইলাম। কেহ বলিতেছেন 'আজ পাঁচ সাত দিন হইল বদরীকাশ্রম হইতে আসিয়াছি, বাসের টিকিট না পাওয়ায় বসিয়া বসিয়া খাইয়া হাতের টাকা সব ফুরাইয়া যাইতেছে।' আবার কেহ বা বলিতেছেন 'এমন লোকের সহিত আসিয়াছি যে সে সমস্ত টাকা ঠকাইয়া লইতেছে। চামেলীতে বাসের একখানি টিকিট কিনিতে দুইখানা দশটাকার নোট দিয়াছিলাম কিন্তু মাত্র তিন টাকা দুই আনা ফেরত পাইয়াছি। এই ভাবে আজ তিন মাস ধরিয়া এক কেদারবদরীর পথেই খরচ হইতেছে। এক এক জায়গায় পাঁচদিন ছয়দিন করিয়া এই বিদেশে থাকিতে হইতেছে।' এই সকল আলোচনা বেশীর ভাগ বাঙ্গালী মহিলা মহল হইতেই শুনা যাইতেছিল।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে নন্তে ফিরিয়া আসিল, টিকিটের ব্যবস্থা হয় নাই। বাসষ্ট্যাণ্ডের নিকট শ্রীবুদ্ধদেব বসুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, বাসের ব্যবস্থা করিতে পারা যাইতেছে না উল্লেখকরায়

তিনি একটু বেলায় আসিয়া দেখা করিতে বলিলেন। যাহা হউক আজ এবেলায় আমাদের যাত্রা স্থগিত রহিল। বলবীরের তত্ত্বাবধানে তল্পীতল্পা রাখিয়া ধর্ম্মশালার বাহিরের এক দোকান হইতে আমরা জলযোগ সারিয়া লইলাম। এখন আমার গন্তব্যস্থল কাশীধাম; একবার বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া কলিকাতায় পৌঁছান, আর কোথাও যাইবার ইচ্ছা নাই। নন্তে ও শ্যামের ইচ্ছা আলামোড়া হইয়া কাশী ও পরে কলিকাতায় যায়। মহারাজ নৈমিষারণ্য ও অযোধ্যা দর্শন করিয়া পরে যে কোথায় যাইবেন কিছু প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন "সবই ঠাকুরের ইচ্ছা"। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যত শীঘ্র সম্ভব বাড়ী (রাণাঘাট) ফিরিতে চাহেন তবে আপাততঃ মহারাজ যে দুইটি তীর্থের নাম উচ্চারণ করিয়াছেন ঐ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগামী হইবেন। এখন বাকি কেবল কানন-ভাই, কিন্তু সে একেবারে বেসুরো গাহিল। সে বলিল 'হাতের টাকা পয়সা সব খরচ হইয়া গিয়াছে, এখান হইতে দেশে টেলিগ্রাম করিয়া টাকা পাঠাইতে বলিব এবং টাকা আসিলে তবে কলিকাতায় যাইব, আপনারা ইচ্ছানুযায়ী রওয়ানা হইতে পারেন।' এইরূপ আলোচনা চলিতেছে, বেলা তখন প্রায় আটটা, নন্তে, শ্যামকে লইয়া পুনঃ বাসের টিকিটের চেষ্টায় বাহির হইয়া গেল। শেষ সিদ্ধান্ত হইল যে বলবীর ব্যতীত আমরা সকলেই উপস্থিত কোটদ্বার হইয়া নাজিবাবাদ যাইব। ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল। স্নানে বাহির হইব ভাবিতেছি এমন সময়ে এক প্রৌঢ়া আসিয়া তাঁহার দলের লোকের কপটাচরণ ও

নানা অব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে আজ পাঁচদিন তাঁহারা বাসের টিকিট কিনিতে না পারায় এই ধর্ম্মশালায় রহিয়াছেন। তিনি ঐ দলে থাকিতে আর প্রস্তুত নহেন, আমি যদি তাঁহাকে একখানি বাসের টিকিটের বন্দোবস্ত করিয়া হাওড়ায় পোঁছাইয়া দিই তাহা হইলে তাঁহার সুবিধা হয়। ভদ্রমহিলা নিজেকে বেশ বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করিতেছেন। নিজেই বার বার বলিতেছেন, যে ভবিষ্যতে এইভাবে অন্যের সহিত বিদেশে বাহির হইবেন না। আমি ভাবিতেছি বাসের ব্যাপারে আমার অবস্থাই বা ইহা হইতে এমন কি প্রভেদ। প্রকাশ্যে বলবীরের মারফত স্ত্রীলোকটিকে শ্রীবুদ্ধদেব বসুর বাসায় পাঠাইয়া দিলাম। বেলা প্রায় সাড়ে দশটা—নন্তে ফিরিয়া আসিল, টিকিটের ব্যবস্থা হইয়াছে। আগামী কল্য প্রাতে সাড়ে পাঁচটার সময় বাস ছাড়িবে। আমরা সানন্দে স্নান সমাপন পূর্ব্বক নিকটস্থ ভোজনালয় হইতে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। বৈকালে বুকিং অফিসে যাইয়া পরদিন প্রাতে প্রথম বাসে যাইবার জন্য নাম লিখাইয়া আসা হইল। এখানে বাসে অগ্রিম স্থান সংরক্ষণ কালে কোন রসিদ পত্র দেওয়া হয়না এবং কোন খরচাও লাগে না। কেবল উহাদের খাতায় ক্রমিক সংখ্যা দিয়া নামগুলি লিখিয়া লয়।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ অন্যান্য দিবসের তুলনায় কিছু প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করতঃ জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিলাম। পৌনে পাঁচটায় শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীনগরের

কালীকম্বলীওয়ালার ধর্ম্মশালা ত্যাগ করিলাম। ধর্ম্মশালা পরিত্যাগ করিলাম বটে কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ বাবা কালীকম্বলীওয়ালার মহত্ব ও ধর্ম্মার্থী যাত্রীদের প্রতি তাঁহার বিশাল দানের ব্যবস্থা অন্তরে জাগরিত রহিল। বাসষ্ট্যাণ্ডের নিকটবর্ত্তী এক-দোকানে প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া তথাকার বৃহৎ চত্বরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বহু বাস শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, চালকেরা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। বাস এখান হইতে দুইপথে চলিতেছে। একটি পথ শ্রীনগর হইতে চামেলী এবং অপরটি শ্রীনগর হইতে কোটদ্বার পর্য্যন্ত। যাত্রীসমাগম রীতিমত হইয়াছে, তাড়াতাড়ি যে বাসে উঠিয়া জায়গা দখল করিয়া বসিব সে উপায় নাই, কারণ টিকিটের উপর কতনম্বর বাসে উঠিতে হইবে লেখা থাকে। আমাদের টিকিট লইয়া নন্তে এখনও ফিরে নাই। বলবীর মালপত্র একস্থানে নামাইয়া দাঁড়াইল, আজ তাহাকে বিদায় দিতে হইবে। মিনিট পাঁচেক দাঁড়াইবার পর নন্তে ও শ্যাম টিকিট লইয়া আসিল এবং আমরা সকলে একখানি বাসে উঠিয়া বসিলাম। শ্রীনগর হইতে কোটদ্বার উচ্চশ্রেণীর ভাড়া ছয়টাকা চারিআনা। বলবীর মালপত্র গাড়ীর চালে উঠাইয়া দিয়া বিদায় লইল। যাইবার সময় বলিয়া গেল যে যদি কখনও দেরাদুন যাই, রাজপুরে তাহার বাড়ী, তাহার সহিত দেখা করিতে যেন না ভুলি।

কুলি সম্বন্ধে এই গাড়োয়াল রাজ্যে একটা নিয়ম আছে, যাঁহারা হৃষিকেশে কুলি যাতায়াত ভাড়া ব্যবস্থা করিবেন তাঁহার

যদি হাঁটাপথে বদরীকাশ্রম দর্শনান্তে হৃষীকেশে ফিরেন, তাঁহার কুলিও মাল লইয়া হৃষীকেশে আসিবে, নতুবা প্রত্যাবর্ত্তন কালে যে স্থান হইতে বাসে উঠিবেন ঐ স্থানেই কুলির ছুটী হইবে। কর্ণপ্রয়াগ হইতে একটি পথ "মেহলচৌরী" হইয়া রামনগর গিয়াছে। যাঁহারা রামনগর হইয়া ফিরিতে চাহেন কুলি তাঁহাদিগকে মেহলচৌরীতেই বিদায় অভিবাদন জানাইবে। পরে যদি কুলির প্রয়োজন হয় তাহা হইলে নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

সাড়ে পাঁচটায় বাসগুলি গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগর ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে ঘন বনরাজীর মধ্য দিয়া চড়াই ও উতরাই পথে অগণিত পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিতে লাগিল। বেশ বুঝিতেছি যে আমরা ক্রমশঃ উচ্চাভিমুখে যাইতেছি। বেলা প্রায় নয়টা "পৌড়ি" নামক স্থানে আসিয়া বাস অর্দ্ধঘণ্টা থামিল। পর্ব্বতোপরি বিস্তীর্ণ জায়গায় বাস ষ্ট্যাণ্ড। একপার্শ্বে বহু দোকান, এখানে প্রধানতঃ গরম দুধ, তৈয়ারী চা, পেঁড়া, ছোলাভাজা এবং ভেলিগুড় প্রভৃতি পাওয়া যায়। আমরা অনেকে বাস হইতে নামিয়া একটি দোকানে দুগ্ধ পান করিলাম। স্থানটি ছোট সহর, হাইস্কুল, কলেজ, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, থানা, ভাল পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রভৃতি সকলই রহিয়াছে। ছোট ছোট ছেলেদের বই হাতে পথ দিয়া দলে দলে যাইতে দেখিয়া বুঝিলাম এ অঞ্চলের লোকদের বিদ্যানুরাগ যথেষ্ট। বাস ক্রমশঃ উতরাই পথে চলিতে সুরু করিল।

রাস্তা আট হইতে দশ ফুট চওড়া কিন্তু এত অসমতল যে গাড়ী যেন লাফ দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছে বলিয়া বোধ হয়। গাড়ীর মধ্যে স্থির হইয়া বসিয়া থাকা একপ্রকার অসম্ভব, আর ধূলাও তেমনি।

উতরাই পথে নামিতে নামিতে যেন কল্পিত পাতাল প্রদেশে আসিলাম। চতুর্দ্দিক নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ, সম্মুখে এক ঝর্ণা ক্ষুদ্র নদীরূপ ধারণ করিয়া নুড়ি রাজ্যের উপর দিয়া কুল কুল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। সূর্য্যকিরণ এ প্রদেশে নাই বলিলেই চলে। জলধারা স্বচ্ছ। একটি ক্ষুদ্র অস্থায়ী সেতু নদীবক্ষে অবস্থিত। বাস কোন প্রকারে হেলিতে দুলিতে যাত্রীদিগকে পরপারে পৌঁছাইয়া দিতেছে। সেতু যেভাবে হেলিতেছে তাহাতে মনে হইল বুঝিবা বাস সমেত আমাদের সলিল সমাধি হয় কিন্তু চালক চকিতে মোড় ঘুরাইয়া প্রায় কুড়ি ফুট উচ্চে আসিয়া বাস থামাইল। এই স্থানের নাম 'সাতপুলি'। এক্ষণে বেলা সাড়ে বারটা বাজিয়াছে। আজ আর স্নান করিবার সুযোগ পাইলাম না। বাস চালককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে এখানে তাহারা প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা অপেক্ষা করিবে। আমাদের বাসের অগ্রে ও পশ্চাতে বহু বাস দাঁড়াইয়াছে। পর্ব্বত গাত্রস্থ সঙ্কীর্ণ স্থানটি যাত্রীসমাগমে বেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। ফেরিওয়ালারা কাঁকড়ি, আম এবং আরও কয়েক প্রকার পাহাড়ী ফল বিক্রয় করিতেছে। পাকা আম এ বৎসর এই প্রথম দেখিলাম। আমরা বাস হইতে অবতরণ করিয়া চারিধার

দেখিতে দেখিতে বহু নিরামিষ ভোজনালয় দেখিতে পাইলাম। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণপ্রায় আর পিত্ত পড়াইয়া লাভ কি! একটি দোকানে প্রবেশ করিয়া ভোজন কার্য্য সারিয়া বাসে আসিয়া বসিলাম। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষার পর বাস ছাড়িয়া দিল। আবার বহুদূর চড়াই পথ অতিক্রম করিয়া উতরাই পথে বাস চলিতে লাগিল। বাসে উতরাই পথে নামিতে বেশ কষ্ট হয়, বিশেষ করিয়া পেট্রোলের গন্ধে ও বাসের ঝাঁকানিতে। এই পথে খুবই জলাভাব কিন্তু বাস যাত্রীর পক্ষে কোন অসুবিধা নাই।

কোটদ্বার-নাজিবাবাদ

শ্রীনগর হইতে পঁচাশি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা সাড়ে তিনটায় "কোটদ্বার" ষ্টেশনের অদূরে বাস থামিল। নূতন কুলির সাহায্যে মালপত্র লইয়া ষ্টেশনের মধ্যস্থ বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলাম। এখানের আবহাওয়া গরম, প্ল্যাটফর্ম্মের পার্শ্বে জলের কল রহিয়াছে। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ স্নান করিয়া লইলেন এবং আমি অবেলায় স্নান না করিয়া গা মুছিলাম। সকলে এদিক ওদিক ঘুরিতে বাহির হইল আর মালপত্র লইয়া আমি বসিয়া আছি—এমন সময়ে শ্রীনগরে যে স্ত্রীলোকটির বাসের টিকিটের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম তিনি আসিলেন। বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম বলিয়া অনেক ধন্তবাদ দিলেন এবং এক্ষণে আমাদের সহিত কলিকাতা যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

আমি সোজা কলিকাতা যাইব না জানাইয়া তাঁহাকে কোটদ্বার হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া দিলাম। চারিটা বাইশ মিনিটে এখান হইতে নাজিবাবাদ অভিমুখে ট্রেন ছাড়িবে। আমরা ঐ ট্রেণেই যাইব। অত্যধিক যাত্রীর ভিড় দেখিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। কোটদ্বার হইতে নাজিবাবাদ দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া একটাকা দুইআনা মাত্র। যথাসময়ে ট্রেণ আসিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইল, দ্রুতপদে একটি কামরায় উঠিয়া পড়িলাম। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। বহুদিন পরে আজ সমতল ক্ষেত্রে আসিয়াছি ; কোটদ্বার হইতে নাজিবাবাদের দূরত্ব পনের মাইল। কিন্তু ট্রেণ একঘণ্টা "লেট্" করিয়া ছয়টা বাইশ মিনিটে "নাজিবাবাদে" পৌঁছিল। ইহা একটি বড় জংসন ষ্টেশন। আমরা বিশ্রামাগারে আশ্রয় লইলাম। পরবর্ত্তী নিম্নাভিমুখী ট্রেণ "ডুন এক্সপ্রেস" রাত্রি এগারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আসিবে। এই সুদীর্ঘ সাড়ে পাঁচঘণ্টা সময় আমাদিগকে ষ্টেশনেই অবস্থান করিতে হইল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মবশতঃ আমার আহারে ইচ্ছা হইল না। রাত্রি নয়টার পর সঙ্গীরা বলিলেন তাঁহারা বাহিরের দোকান হইতে নৈশ ভোজন সারিয়া লইয়াছেন। ঠাণ্ডাজিনিষই খাইতে ইচ্ছা, ভাল ঘোলের সরবৎ এক ভাঁড় পান করিলাম। ট্রেণের সময় হইয়া আসিল। আমরা চারিখানা কাশীর টিকিট কাটার ব্যবস্থা করিলাম। নাজিবাবাদ হইতে বেনারস তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া এগারটাকা তেরআনা। মহারাজ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়

নৈমিষারণ্যের টিকিট কিনিলেন। বালামৌ ষ্টেশনে নামিয়া ষোলমাইল দূরে নৈমিষারণ্য, বালামৌ সীতাপুর ব্রাঞ্চ লাইনে অবস্থিত। প্রায় ত্রিশমিনিট দেরী করিয়া ট্রেণ আসিল। প্ল্যাটফর্ম্মে জনতা ব্যগ্রভাবে ছুটাছুটি সুরু করিয়া দিল। আমরা অগ্রিম কুলি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, মালপত্র লইয়া কোন প্রকারে তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরায় প্রবেশ করিলাম। ভিড়ের মধ্যে ট্রেণে বসিয়া রাত্রি অতিবাহিত হইল।

কাশীধাম

২৬শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে সাড়ে সাতটায় মহারাজ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় বালামৌ ষ্টেশনে বিদায় লইলেন। মহারাজের মধুর সঙ্গ আমার বেশ ভাল লাগিত। এই সুদূর তীর্থে তাঁহার সহিত একত্রে বহু দিবস বাস করিলাম কিন্তু একদিনও অপরিচিত বলিয়া মনে হয় নাই। ট্রেণে এখন কিছুটা গুছাইয়া বসিয়াছি। পাশাপাশি যাত্রীদের সঙ্গে আলাপ জমিয়াছে। বদরীকাশ্রম হইতে ফিরিতেছি জানিয়া তাঁহারা আমাদের ভ্রমণের রুচির তারিফ করিলেন এবং কিছু কিছু নিজেদের ভ্রমণ বৃত্তান্তও শুনাইলেন। এবৎসর এদিকে এতদিন বৃষ্টি হয় নাই; আজ প্রথম বেলা তিনটা হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বৈকাল তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে "বেনারস কেণ্টনমেণ্টে" ট্রেণ থামিল। নাজিবাবাদ হইতে চারিশত পঞ্চাশ মাইল পথ

আসিলাম। বৃষ্টি এখন প্রশমিত হইয়াছে, কুলির সাহায্যে মাল লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া একখানি টঙ্গা ভাড়া করিলাম। 'পাঁড়ের' ধর্ম্মশালায় উঠিব। টঙ্গা ভাড়া একটাকা ছয় আনা ঠিক হইল। আজ যাত্রী সমাগম অধিক সেইজন্যই এত ভাড়া। অধ্যক্ষের নিকট ধর্ম্মশালায় স্থান প্রার্থনা করায় তিনি ভদ্রভাবে জানিতে চাহিলেন সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক আছেন কি না? উত্তরে 'না' বলায় আমাদিগকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল, যেহেতু আমরা সস্ত্রীক নহি। আরও দু এক জায়গায় উঠিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু সর্ব্বত্রই স্থানাভাব পরিদৃষ্ট হইল। নিকটে গোধূলিয়ায় মডার্ণ বোর্ডিংএর দ্বিতলে একখানি ঘর পাইলাম। পরদিন ভোর পাঁচটায় সারনাথ যাইব বলিয়া টঙ্গাওয়ালাকে পুনঃ আসিতে বলিলাম।

আজ অতিশয় গরম। গতরাত্রে ট্রেণের ভিড়ে ঘুমাইতে পারি নাই, তা ছাড়া পূর্ব্বদিবসে শ্রীনগর হইতে কোটদ্বার আসিবার সময় স্নান হয় নাই। সারাদিন বাসের ধূলায় ও সারারাত ইঞ্জিনের কয়লার গুঁড়ায় দেহ বিবর্ণ হইয়াছে। শীত প্রধান দেশ হইতে এই গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে উত্তাপের তীক্ষ্ণতা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আমাদের চেহারা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে আমরা বদরীকাশ্রম ফেরত যাত্রী। কলিকাতা হইতে রওনা হইবার সময় একখানি গায়ে মাখা সাবান আনিয়াছিলাম শীতের প্রাবল্যে ঐ অঞ্চলে এতদিন ব্যবহার করা হয় নাই; আজ উহা মাখিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক স্নান করিলাম।

স্নানান্তে সর্ব্বপ্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা এবং মন্দির সংলগ্ন অপরাপর বিগ্রহগুলি দর্শন করিলাম। মন্দিরে বিশেষ ভিড় নাই, দর্শন ভাল ভাবেই হইল। কাশীধামে পূর্ব্বে আমি বহুবার আসিয়াছি, কেবল সঙ্গীদের দর্শন করাইবার জন্যই এ যাত্রায় আসা। মন্দিরের পথে দুই পার্শ্বে পিত্তলের বাসন, কাঠের খেলনা, পানের মসলা এবং বেনারসী শাড়ী ও আরো অনেক জিনিসের দোকান ঝকমক্ করিতেছে। প্রয়োজন মত কিছু সওদা করিলাম। এখন আমরা ঘর মুখো। আগামী কল্য চারিটা বত্রিশ মিনিটে ডাউন বেনারস এক্সপ্রেসে এখান হইতে যাত্রা করিব। নন্তে ও শ্যামকে দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থের জন্য ষ্টেশনে পাঠাইলাম। কিন্তু কাজ হইল না। আজ আর বেশী ঘোরাঘুরি না করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। বোডিংয়ে আহারাদির বন্দোবস্ত আছে। বৈদ্যুতিক পাখা সহ তিনজনের ব্যবহারের উপযুক্ত ঘরের ভাড়া দৈনিক চারিটাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীর আহার্য্য এক বেলায় জন প্রতি দুই টাকা এবং জলযোগ স্বতন্ত্র। রাত্রি দশটায় আহার শেষ করিয়া শয়ন করিলাম।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ—প্রাতে টঙ্গাওয়ালার ডাকে ঘুম ভাঙ্গিল। ঘড়িতে দেখি ছয়টা বাজে। সকাল সকাল সারনাথ ঘুরিয়া আসিতে হইবে। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে এক দোকানে জলযোগের ব্যবস্থা হইল। সহর অতিক্রম করিয়া সারনাথগামী টঙ্গা বড় রাস্তায়

পড়িল। পথের দুই পার্শ্বে সুবিস্তৃত আম বাগান, গাছগুলি ফলে পরিপূর্ণ; সূর্য্যকিরণে হরিতাভ আমগুলি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন আকাশে তারকাপুঞ্জ দীপ্তি পাইতেছে। এইরূপ প্রচুর আম ফলিতে খুব কমই দেখা যায়। টঙ্গা সারনাথে আসিয়া একস্থানে থামিল, আমরা পদব্রজে সারনাথের মন্দির, সারনাথ স্তূপ, বৌদ্ধ মন্দির এবং বহু শতাব্দীর ধ্বংস প্রাপ্ত পুনরাবিষ্কৃত বৌদ্ধবিহার দেখিয়া বুদ্ধ মন্দিরের সম্মুখস্থ রাস্তায় আসিলাম। রাস্তার বিপরীত দিকে একখানি বৃহৎ লেংড়াই আমের বাগান। ছোট ছোট গাছগুলি আমের ভারে মাথা তুলিতে পারিতেছে না, দেখিতে অতি সুন্দর। ধীরে ধীরে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। মালী রহিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলাম যে আম বিক্রয় করিবে কি না? সে বলিল 'হাঁ বাবু।' আম মিষ্টি কি টক্ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। আমার কথায় লোকটি সোল্লাসে বাছাই বাছাই পাকা পাকা আম গাছ হইতে পাড়িয়া আমাদের প্রত্যেককে দুইটি করিয়া খাইতে দিল। অতি সুস্বাদু। নয়টাকা শ' হিসাবে চারিশত আম (এক শ' ত্রিশে শ) লইয়া বোর্ডিং-এ ফিরিলাম। টঙ্গাওয়ালাকে যাতায়াত ভাড়া পুরাপুরি ছয় টাকা দিতে হইল। আজ আমাদের এ যাত্রার শেষ বাঁধাবাঁধি। নন্তে ও শ্যাম প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে কলিকাতাগামী বেনারস এক্সপ্রেসে চারিখানি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে সিট রিজার্ভ করিয়া ফিরিল। বেনারস হইতে হাওড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া কুড়ি টাকা তের আনা এবং সিট

রিজার্ভের দরুণ অতিরিক্ত চারি আনা দিতে হয়। অত্যধিক ভীড়, সকাল সকাল ষ্টেশনে পৌঁছাইতে হইবে। স্নান সারিয়া সঙ্গীদের কালভৈরব ও মানমন্দির দেখাইয়া আনিলাম। আহারান্তে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বোর্ডিংএর খরচপত্র মিটাইয়া দুইখানি সাইকেল রিক্সা ভাড়া করিয়া জয় বাবা বিশ্বনাথ কি জয় বলিতে বলিতে ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করিলাম। তিনটার সময় প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়া ট্রেণের মধ্যে বসিলাম। সঙ্গীরা কেহ কেহ বাহিরে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর বেড়াইতে লাগিল। প্রায় চারিটা বাজিয়াছে, ডাউন ডুন এক্সপ্রেস আসিয়া বিপরীত দিকস্থ প্ল্যাটফর্ম্মে থামিল। নিস্তব্ধ ষ্টেশন চত্বর ফেরিওয়ালা ও যাত্রীতে ভরিয়া গেল। আমি ট্রেণের মধ্যে বসিয়া ভিড় দেখিতেছি; কত লোক উঠিতেছে ও নামিতেছে। উঃ কী ভিড়! এমন সময় দেখি নন্তে, মহারাজ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত কথা কহিতে কহিতে আমাদের গাড়ীর কামরার নিকটে আসিতেছে। আমি সানন্দে মহারাজ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দিকে হাত তুলিয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করিলাম এবং তাঁহারাও হাসিতে হাসিতে প্রত্যভিবাদন জানাইলেন। মহারাজের সহিত এ পথে আবার দেখা হইবে ভাবি নাই, তাঁহারা নৈমিষারণ্য ও অযোধ্যাভ্রমণ সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। বিশেষ ক্লান্তি বোধ করায় অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

এদিকে আমাদেরও সময় হইল। গাড়ী ধীরে ধীরে যখন সেতুর উপর উঠিল তখন একবার জানালার মধ্যদিয়া পুণ্যভূমি

বারাণসী ধামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। যুগযুগান্তর ধরিয়া বরুণা অর্দ্ধবৃত্তাকারে সহরটিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে এবং তাহার কোলে বহু সিঁড়ি সহ ঘাট, মন্দির, অট্টালিকা ও কুটীর সুদৃশ্য চিত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কেবল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বেণীমাধবের ধ্বজায়; দুইটি মিনার এখন একটিতে পরিণত হইয়াছে। বরুণার পুরাতন রেলের সেতুটি নবকলেবর ধারণ করিয়া 'মালব্য ব্রীজ' নামে অভিহিত হইয়াছে। ট্রেণের গতি বর্দ্ধিত হইয়া হুহু শব্দে চলিতে লাগিল।

কামরার মধ্যে বাঙ্কের উপর বিছানা পাতিয়া আরাম করিয়া শুইয়া পড়িলাম। আজ আর কোন কাজ নাই। পরদিন প্রাতে নূতন অজানা পথের সন্ধান বা চড়াই উতরাই অতিক্রম করিতে হইবে না। এখন সকল অজানার সমাধান হইয়াছে, সমতলে আসিয়াছি। বাহিরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, মৃদু মৃদু বৃষ্টি পড়িতেছে, বায়ুপ্রবাহ ও লৌহবর্ত্মে লৌহচক্র আবর্ত্তনের রব শ্রবণেন্দ্রিয় স্পর্শ করিল। স্মৃতি দৌড়াইল হিমালয় বক্ষে বদরীকার পথে! অলকানন্দা, মন্দাকিনী, শোনগঙ্গার কুলকুল ধ্বনি কর্ণপটে প্রতিধ্বনি তুলিল। কেদার ও বদরীর তুষারক্ষেত্র, মন্দাকিনীর শীতল ও গৌরীকুণ্ডার তপ্তবারি স্পর্শশক্তিকে অনুভূতি দিল। রামপুরের তেপান্তরে গোলাপের সৌরভ কোনরূপ কার্পণ্য না করিয়া আঘ্রাণকে তৃপ্তিদান করিল। অন্তহীন শ্যামল বনরাজি, অক্ষয় শৈলশ্রেণী, অনন্তকাল প্রবাহী নির্ঝরিণীসমূহ স্মরণ করাইয়া দিল স্রষ্টার অনন্ত রূপ মাধুরী। বদরীকারণ্যে নারায়ণের রুদ্ধদ্বার প্রান্তে দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া

করযোড়ে দাঁড়াইয়া নানান শ্রেণীর যাত্রীর ভক্তিগদগদকণ্ঠে স্তুতিগানের সুমধুর স্বর আমার মনে যে ভক্তিরসের উদ্রেক করিয়াছিল এখন তাহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলাম। ভাবিতেছি শ্রীশ্রীনারায়ণের আবাস শ্রীবৈকুণ্ঠে পৌঁছিয়াছি, আমার বদরীকা যাত্রা সফল হইয়াছে। বহু জল্পনা কল্পনা ও বাধাবিঘ্ন প্রভৃতি রহস্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মনের আনন্দে গাহিতে লাগিলাম।

"আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো ; সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর,—
আজি বহিতেছে
প্রাণে মোর শান্তিধারা ; মনে হইতেছে
সুখ অতি সহজ সরল।"

রাত্রি সওয়া দশটা, ট্রেন দানাপুরে আসিল। কানন ভাইএর তাগিদে বাঙ্ক হইতে নামিলাম। আহারের ব্যবস্থা হইয়াছে, আমার জন্য নিরামিষ রুটি তরকারী এবং আর সকলে আমিষ। আহারান্তে শুইবামাত্র গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলাম। পূণ্য সলিলা গঙ্গার বহুধারা হিমালয় বক্ষে নানা ছন্দে ও ধ্বনিতে নৃত্য করিয়া যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে, সেই নয়ন তৃপ্তিকর দৃশ্য অনুক্ষণ নিদ্রায় ও জাগরণে অনুভূত হইতে লাগিল। চারিশত আটাশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কাশীধাম হইতে হাওড়া ষ্টেশনে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বেলা বারটার সময় আসিয়া পৌঁছাইলাম। যাত্রা সম্পূর্ণ করিতে পূর্ণ এক মাসকাল (৩১ দিন) লাগিল।

বদরীকাশ্রম ভ্রমণ সম্পূর্ণ করিতে মোট ব্যয় সম্বন্ধে ভাবী যাত্রী মাত্রেরই জানিবার একটা আকাঙ্ক্ষা হয়। অবশ্য এ বিষয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকার অঙ্ক বলা কঠিন; যেহেতু সঙ্গতি অনুযায়ী খরচের তারতম্য ঘটে। এ সম্বন্ধে গ্রন্থ মধ্যে যথাস্থানে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি পুনরায় মোটামুটি একটি খরচের তালিকা সংযোজিত করিলাম।

হাওড়া হইতে বদরীকাশ্রম যাতায়াতের হিসাব।

রেল ভাড়া	৩য় শ্রেণী	....	....	টা ৫১ ৶০
বাস ,,	উচ্চ ,,	....	....	,, ২৩৲
কুলি ,,	খুচরা	....	....	,, ২৲
,, ,,	২৫ সের মালের ৩৲ টাকা সের হিঃ			,, ৭৫৲
পাণ্ডা ও তীর্থ কার্য্যাদিতে মোট		....	...	,, ৫০৲
খুচরা দানাদিতে		....	...	,, ৩৸/০
আহারাদি দৈনিক গড়ে ২॥০ টাকা হিঃ			....	,, ৭৫৲
			মোট	২৮০৲ টাকা

উপসংহার

উপসংহারে পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য আমি হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া বদরীকার পথে তীর্থ ভ্রমণ কালে যে সকল স্থানে অবস্থান করিয়াছিলাম তাহার একটি ধারাবাহিক তালিকা প্রদান করিয়া আমার লেখা সমাপ্ত করিব।

তারিখ	মাইল	স্থান	সময়	পথ
২৮শে বৈশাখ ১৩৫৭		হাওড়া (ত্যাগ)	৮—৫ রাত্রি	রেল
৩০শে „	৯২২	হরিদ্বার (পৌছান)	৬—৩০ প্রাতঃ	
৩১শে „		„ (ত্যাগ)	৭—৩০ „	বাস
„ „	১৪	হৃষীকেশ (পৌঃ)	৯—৩০ „	
১লা জ্যৈষ্ঠ		„ (ত্যাঃ)	৭—৪৫ „	„
„ „	৪৪	দেবপ্রয়াগ (পৌঃ)	১২—১৫ দিবা	
২রা জ্যৈষ্ঠ		„ (ত্যাঃ)	১—০ „	„
„ „	১৫	কীর্ত্তিনগর (পৌঃ)	৩—০ বৈকাল	
„ „		„ (ত্যাঃ)	৪—০ „	হাঁটা
„ „	৩	শ্রীনগর (পৌঃ)	৫—৩০ „	
৩রা „		„ (ত্যাঃ)	৫—৩০ প্রাতঃ	বাস
„ „	২২	রুদ্রপ্রয়াগ (পৌঃ)	৬—৪৫ „	
৪ঠা „		„ (ত্যাঃ)	৫—৩০ „	হাঁটা
„ „	৭	রামপুর (পৌঃ)	৯—৩০ „	
„ „		„ (ত্যাঃ)	২—১৫ বৈকাল	„
„ „	৪½	অগস্ত্যমুনি (পৌঃ)	৪—১০ „	

তারিখ	মাইল	স্থান	সময়	পথ
৫ই জ্যৈষ্ঠ		অগস্ত্যমুনি (ত্যাঃ)	৫—০ প্রাতঃ	হাঁটা
„ „	১১	কুণ্ড (পৌঃ)	১১—০ দিবা	
„ „		„ (ত্যাঃ)	৩—২৫ বৈকাল	„
„ „	২	গুপ্তকাশী (পৌঃ)	৫—২৫ „	
৬ই „		„ (ত্যাঃ)	৬—৩০ প্রাতঃ	„
„ „	৫½	মৈখণ্ডা (পৌঃ)	৯—৫০ দিবা	
„ „		„ (ত্যাঃ)	৪—০ বৈকাল	„
„ „	১½	ফাটা (পৌঃ)	৪—৩০ „	
৭ই „		„ (ত্যাঃ)	৫—০ প্রাতঃ	„
„ „	১০	ত্রিযুগীনারায়ণ (পৌঃ)	১০—৫০ দিবা	
„ „		„ (ত্যাঃ)	৩—৩০ বৈকাল	„
„ „	৩½	গৌরীকুণ্ড (পৌঃ)	৭—০ সন্ধ্যা	
৮ই „		„ (ত্যাঃ)	৯—৩০ দিবা	„
„ „	৭	কেদারনাথ (পৌঃ)	৩—৪৫ বৈকাল	
৯ই „		„ (ত্যাঃ)	১০—৩০ দিবা	„
„ „	৩½	রামওয়াড়া (পৌঃ)	১২—৪৫ „	
১০ই „		„ (ত্যাঃ)	৫—৫০ প্রাতঃ	„
১০ই জ্যৈষ্ঠ	৮½	রামপুর (পৌছান)	১১—০ দিবা	
„ „		„ (ত্যাঃ)	৩—৪৫ বৈকাল	„
„ „	৬½	মৈখণ্ডা (পৌ)	৬—২০ সন্ধ্যা	
১১ই জ্যৈষ্ঠ		„ (ত্যাঃ)	৬—০ প্রাতঃ	„
„ „	৮½	উখীমঠ (পৌঃ)	১০—১৫ দিবা	
১২ই জ্যৈষ্ঠ		„ (ত্যাঃ)	৫—৩০ প্রাতঃ	„

কাণ্ডী ওযালা - পৃঃ ১০

তারিখ	মাইল	স্থান		সময়	পথ
১২ই জ্যৈষ্ঠ	৮½	পথিবাসা	(পৌঃ)	১১—২৫ দিবা	
" "		"	(ত্যাঃ)	৩—৩০ বৈকাল	হাঁটা
" "	২½	বানিয়াকুণ্ড	(পৌঃ)	৫—৩০ "	
১৩ই জ্যৈষ্ঠ		"	(ত্যাঃ)	৫—৩০ প্রাতঃ	"
" "	৩	তুঙ্গনাথ	(পৌঃ)	৮—০ "	
" "		"	(ত্যা)	৯—৪৫ দিবা	"
" "	২½	ভূলোকনা	(পৌঃ)	১১—৪৫ "	
" "		"	(ত্যাঃ)	৩—০ বৈকাল	"
" "	৬½	মণ্ডল	(পৌঃ)	৬—৩০ সন্ধ্যা	
১৪ই জ্যৈষ্ঠ		"	(ত্যাঃ)	৫—১০ প্রাতঃ	"
" "	৮½	চামেলী	(পৌঃ)	১০—০ দিবা	
" "		"	(ত্যাঃ)	২—৩০ "	"
" "	২	মঠ	(পৌঃ)	৩—৪৫ বৈকাল	
১৫ই জ্যৈষ্ঠ		"	(ত্যাঃ)	৫—১৫ প্রাতঃ	"
" "	১১	গরুড় গঙ্গা	(পৌঃ)	১০—০ দিবা	
১৬ই জ্যৈষ্ঠ		"	(ত্যাঃ)	৪—৪৫ প্রাতঃ	"
" "	১৫	যোশীমঠ	(পৌঃ)	১২—৩০ দিবা	
১৭ই জ্যৈষ্ঠ		"	(ত্যাঃ)	৪—৪৫ প্রাতঃ	"
" "	৮	পাণ্ডুকেশ্বর	(পৌঃ)	১০—৫০ দিবা	
১৮ই জ্যৈষ্ঠ		"	(ত্যাঃ)	৫—৩০ প্রাতঃ	"
" "	১১	বদরীকাশ্রম	(পৌঃ)	১২—০ দিবা	
২৭শে জ্যৈষ্ঠ		"	(ত্যাঃ)	৭—১৫ প্রাতঃ	"
" "	৯	লামবগড়	(পৌঃ)	১১—২০ দিবা	

তারিখ	মাইল	স্থান		সময়	পথ
২০শে জ্যৈষ্ঠ		লামবগড়	(ত্যাঃ)	৩—৩০ বৈকাল	হাঁটা
„ „	২½	পাণ্ডুকেশ্বর	(পৌঃ)	৪—৪৫	„
২১শে জ্যৈষ্ঠ		„	(ত্যাঃ)	৫—৩৫ প্রাতঃ	„
„ „	৮	যোশীমঠ	(পৌঃ)	১০—০ দিবা	
„ „		„	(ত্যা)	৩—১৫ বৈকাল	„
„ „	৬	কুমাব	(পৌঃ)	৫— ৪৫	„
২২শে জ্যৈষ্ঠ		„	(ত্যাঃ)	৫—৩৫ প্রাতঃ	„
„ „	৯	গরুড় গঙ্গা	(পৌঃ)	১০—৩০ দিবা	
„ „		„	(ত্যাঃ)	৪— ০ বৈকাল	„
„ „	৪	পিপলকুঠি	(পৌ.)	৫—১৫	„
২৩শে জ্যৈষ্ঠ		„	(ত্যাঃ)	৫—১৫ প্রাতঃ	„
„ „	৯	চামেলী	(পৌঃ)	১০—০ দিবা	
„ „		„	(ত্যাঃ)	৩—৫০ বৈকাল	বাস
„ „	৬০½	শ্রীনগর	(পৌঃ)	৯—৩০ রাত্রি	
২৫শে জ্যৈষ্ঠ		„	(ত্যাঃ)	৫—৩০ প্রাতঃ	„
„ „	৮৫	কোটদ্বার	(পৌঃ)	৩—৩০ বৈকাল	
„ „		„	(ত্যাঃ)	৪—২২ „	ট্রেণ
„ „	১৫	নাজিবাবাদ	(পৌঃ)	৬—২২ সন্ধ্যা	
„ „		„	(ত্যাঃ)	১১—৪৫ রাত্রি	„
২৬শে জ্যৈষ্ঠ	৪৫০	কাশীধাম	(পৌঃ)	৩—৫০ বৈকাল	
২৭শে জ্যৈষ্ঠ		„	(ত্যাঃ)	৪—৩২ „	„
২৮শে জ্যৈষ্ঠ	৪২৮	হাওড়া (কলিঃ)	(পৌঃ)	১২—০ দিবা	

সমাপ্ত

শুদ্ধি-পত্র

পত্রাঙ্ক	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১১	অজান্তা	অজন্তা
৮	২০	ভোহই	ইহাতে
২৭	৬	আমার	আমায়
৫১	২১	জানাইল	জানাইলেন
৬১	১	অপ্রসস্ত	অপ্রশস্ত
৮৭	২	তৃতায়	তৃতীয়
৯১	২২	ইতঃস্ততঃ	ইতস্ততঃ
১০৭	৯	ক্রমাম্বয়ে	ক্রমান্বয়ে
১১২	৭	আলামোড়া	আলমোড়া